হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। তার ওপর দুজনে একেবারে পাশাপাশি। দীপু আর তপু। দীপক আর তপেন।

দুজনে একই বাড়ির ছেলে। গলির একেবারে কোণে যে লালরংয়ের বাড়ি, তারই একতলার ভাড়াটে। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। প্রায় একবয়সী। খুব হিসাব করে দেখলে জানা যায় দীপু তপুর চেয়ে মাস দুয়েকের বড়।

পাড়ার হিন্দুনিকেতনে দুজনে আট ক্লাসে পড়ে। পড়ে মানে বই খাতা হাতে করে স্কুলে যায় ওই পর্যন্ত, ক্লাসে বেশীক্ষণ থাকে না। বেরিয়ে পড়ে। তারপর সারাটা দুপুর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এখন লোকের বাগান বিশেষ নেই। গাছপালা কেটে কারখানা চালু হচ্ছে। কাজেই পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করার সুবিধা নেই। খাল বিলে মাছ ধরার সুযোগও কম।

দুজনে শহরতলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সাধুর ভেলকিবাজি দেখে, কোথাও বানরনাচ, আবার কোন কোনদিন বই খাতা মাথায় পার্কে টানা ঘুম লাগায়।

এর জন্য বাড়িতে যে লাঞ্ছনা জোটে না, এমন নয়।

তপেনের বাপ নেই। অনেকদিন মারা গেছে। দীপুর বাবাই অভিভাবক। ধরেন যখন তখন দুজনকে আধমরা করেন। আস্ত কঞ্চি পিঠের ওপর ভাঙেন।

দিন কয়েক ঠিক থাকে। স্কুলে যায়। বাড়িতে মাস্টারের কাছেও পড়তে বসে। তারপর আবার যে কে সেই।

দীপু তপুর মায়েরা কান্নাকাটি করে। বিশেষ করে তপুর মা। এখন থেকে যদি লেখাপড়া না করে, এভাবে দুরন্তপনা চালায়, তবে ভবিষ্যতে দুজনে যে দুটি ডাকাত হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সেদিন রবিবার। স্কুলের বালাই নেই, লেখাপড়ায় পাঠ নয়। ভোরবেলা দু কাপ চা আর দুখানা রুটি খেয়ে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বেঞ্চে বসে বসে ভাবছে এরপর কি করা যায়।

ন্যাশনাল আয়রন কোম্পানির পিছনের মাঠে বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। কলকাতা থেকে বিখ্যাত যাত্রার দল এসেছে। মাথুর পালা হবে।

তপু আর দীপু দুজনেই বসে বসে ভাবছে, বাড়িতে কি বলে তারা দুজনে ওই যাত্রার আসরে গিয়ে বসবে। সারা রাতের ব্যাপার। বাড়ি থেকে যেতে দেবে এমন সম্ভাবনা কম।

দীপু বলল, তপু, একটা মতলব বের কর।

তপু বসে বসে হাতের আঙুল কামড়াচ্ছিল, আঙুলটা মুখ থেকে বের করে বলল, আমি বলি কি, চলেই যাই দুজনে, ভোর ভোর চুপিচুপি ফিরে আসব এখন।

দীপু মাথা নাড়ল, দূর, তা হবে না। বাবা কি রকম কড়া লোক জানিস তো। রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে সব ঘরগুলো একবার দেখবে, আবার ভোরবেলা উঁকি দেবে ঘরে ঘরে। সব ঠিক আছে কি না। রাত বারোটার আগে বাবা শুতে যায় না, আবার ওঠে সেই ভোর চারটেয়।

তপু বলল, ঘরে ঢুকে জ্যাঠা গায়ে হাত দিয়ে তো আর দেখবে না। জানলা দিয়ে দেখবে। আমরা দিব্যি বালিশের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রাখব। জ্যাঠা বুঝতে পারবে না।

ব্যবস্থাটা দীপকের খুব মনঃপূত হল না।

নিজের বাপকে সে খুব ভাল করেই চেনে। পাশবালিশ দিয়ে তাঁকে ঠকানো যাবে না। অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে।

কিন্তু অন্য কিছু ভাববার আর সময় পেল না। হইচই চীৎকারে চমকে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল।

একটা কানা ভিখারী রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল, লাঠি ঠুকে ঠুকে, হঠাৎ ইটবোঝাই একটা লরি এসে পড়ল।

দীপু আর তপু যখন গিয়ে পৌঁছল দেখল চাপ চাপ রক্তের মাঝখানে ভিখারীটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

লরিটা পালাতে পারে নি। লোকেরা আটকে রেখেছিল।

দীপু আর তপু ধরাধরি করে ভিখারীকে লরির ওপর তুলল। ড্রাইভারকে বলল দ্রুত হাসপাতালের দিকে চালাতে।

মাঝপথ থেকে একটা পুলিসও উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে।

শহরের হাসপাতালে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরের রোদ চারদিক জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করার পর ভিখারীকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। দীপু আর তপু বাইরে বসে রইল।

একটা নার্স এসে তাদের সামনে যখন দাঁড়াল তখন প্রায় পাঁচটা। দীপু আর তপু দুজনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

কি হল? কেমন আছে?

দীপু প্রশ্ন করল।

নার্স ধীরে ধীরে মাথা দোলাল।

খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, মারা গেছে। বাঁচানো গেল না।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়াল। ওই কানা ভিখারীকে তারা চিনত। লাঠি হাতে করে বাড়ির দরজায় দরজায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। চমৎকার গানের গলা।

মনে আছে, কতদিন বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে দীপু আর তপু চাল আলু এনে ভিখারীর ঝুলিতে ফেলে দিয়েছে।

ভিখারীটা শেষ হয়ে গেল। আর কোনদিন তার গান শোনা যাবে না।

দুজনে ক্লান্ত পায়ে, পরিশ্রান্ত দেহে যখন বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

দরজার কড়ায় আর হাত রাখতে হল না, দীপকের বাবা লিকলিকে বেত হাতে উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুজনের ওপর। তারপরই এলোপাথাড়ি মার।

সেই সাতসকালে চা আর রুটি খেয়ে দুজনে বেরিয়েছিল, সারাটা দিন পেটে কিছু পড়ে নি, তারপর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দুজনেই ব্যাকুল ছিল।

চীৎকার করে আসল ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল, কোন ফল হল না। রাগ চণ্ডাল, রাগলে দীপকের বাবা চণ্ডালেরও অধম। দুজনের চুলের মুঠি ধরে অবিশ্রান্ত প্রহার। বাড়ির লোক দীপকের বাপকে খুব চেনে, সেইজন্য কেউ বাড়ির বাইরে এল না।

দীপকের বাবা নিজে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন বেতটা উঠানে আছড়ে ফেলে দিয়ে পাশের ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

একটা পেঁপেগাছের তলায় দীপু আর তপু নির্জীবের মতন পড়ে রইল। শরীরের

অনেক জায়গা কেটে রক্তপাত হচ্ছে। দু'এক জায়গায় কালশিটে পড়েছে। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ।

এই সময়ে একটু জল পেলে হত। কিন্তু কোথায় জল? কে দেবে জল?

তপু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

টলতে টলতে দীপুর কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল।

দীপু, এই দীপু।

দীপু চোখ চেয়েই ছিল, বলল, কি?

এ বাড়িতে আর থাকব না। কোন কথাই জ্যাঠা শুনতে চাইল না। বেমালুম পেটালে শুধু।

দীপুও উঠে দাঁড়াল। জামা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

আমারও থাকতে ইচ্ছা করছে না এ বাড়িতে। চল, কোথাও চলে যাই।

কোথায় যাবি?

যে কোন দিকে হোক। এদেশে বনজঙ্গল কম আছে।

বনজঙ্গল যেমন আছে, তেমনই বাঘ ভালুকও আছে তো।

থাক না, এভাবে নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে, বাঘ ভালুকের পেটে যাওয়া ঢের ভাল।

ঠিক বলেছিস, চল।

দীপু আর তপু চলতে শুরু করল।

রাত তখনও বেশী হয় নি। পথে লোকচলাচল রয়েছে। দীপু আর তপু আলোর সীমানা থেকে সরে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে লাগল। যাতে কারো চোখে না পড়ে। তা ছাড়া আলোয় শরীরের রক্তাক্ত চিহ্নগুলো দেখা যাবে। লোকে হয়তো প্রশ্ন করবে তা নিয়ে। এই এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

প্রায় মাইলখানেক চলার পর দুজনে থামল।

আর তাদের চলার শক্তি নেই। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।

দীপু বলল, আর পারছি না রে তপু।

তপুর অবস্থাও তথৈবচ। চলতে চলতে সে পথে অনেকবার দাঁড়িয়েছিল। এমন কি মনে মনে একবার ভেবেওছিল, দীপুকে বলবে বাড়িতে ফিরে যাবার কথা। লজ্জায় পারে নি।

তপু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমারও দুটো পা টনটন করছে।

দীপু এদিক ওদিক দেখল তারপর উৎসাহের সুরে বলল, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

কি মতলব?

বলছি।

দীপু বলল না। অনেক দূরে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা লরি আসছিল, সেইদিকে চেয়ে রইল।

লরিটা কাছে আসতে দীপু দুটো হাত মাথার ওপর তুলে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল, থাম, থাম। জরুরী দরকার আছে।

ব্রেক কষে লরিটা থামল। একটু দূরে।

দীপু আর তপু দৌড়ে লরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করল।

কি হয়েছে? থামতে বললে কেন?

দীপু বলল, কোথায় যাচ্ছে লরি?

শহরে। খিদিরপুর ডকে।

আমাদের নিয়ে যাবে লরিতে?

ড্রাইভার বিস্মিত হল।

দুটো হাত মাথার ওপর তুলে ··

তোমরা দুটো বাচ্চা, এই রাতে কোথায় যাবে?

খিদিরপুরেই যাব আমরা। মাসীমার বাড়ি। পয়সা হারিয়ে ফেলেছি, তাই বাসে উঠতে পারছি না। আমরা খিদিরপুরে নেমে যাব।

ড্রাইভার কিছুক্ষণ কি ভাবল। ঝুঁকে পড়ে দুজনকে দেখল, তারপর দরজা খুলে বলল, উঠে এস।

দীপু আর তপু দুজনে কেউ হেডলাইটের সামনে যায় নি, পাছে ড্রাইভার তাদের শরীরের অবস্থা দেখতে পায়।

তারা লরির ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই লাফিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল।

তারপর একটানা যাত্রা। মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে অন্য যানবাহনের আসা-যাওয়া। ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

দীপু আর তপু কেউ কথা বলতে সাহস করল না।

ড্রাইভারই একসময়ে কথা বলল।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। পকেট থেকে পয়সা চুরি গেল ভারি লজ্জার কথা। শহরে কিন্তু আরো সাবধান হয়ে থাকবে। শহর বড় খারাপ জায়গা। চোর জোচ্চোরদের আস্তানা।

দুজনেই মাথা নেড়ে ড্রাইভারের কথায় সায় দিল।

শহরে যে কটা দিন থাকবে, খুবই সাবধানে থাকবে তারা।

তপু জিজ্ঞাসা করল, লরিতে কি যাচ্ছে?

পাট। পাট নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায় যাবে পাট?

আমি তো খিদিরপুরের ডকে মাল নামিয়ে দেব। সেখান থেকে জাহাজে উঠে পাট বিলেত চলে যাবে।

দীপু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানুষ না হয়ে পাট হলেই বুঝি ভাল হত। এভাবে মেরে কেউ লোপাট করে দিতে পারত না। তা ছাড়া মহানন্দে ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে দেশদেশান্তরে পাড়ি দেওয়া যেত।

একটু বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল দুজনের, হঠাৎ ড্রাইভারের কথার চমকে উঠল।

এই তো খিদিরপুর। তোমরা কোথায় নামবে?

দীপু আর তপু চোখ খুলে বাইরে দেখল।

সারি সারি অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে। কিছু জাহাজ মাঝনদীতেও নোঙর করা রয়েছে। রাত বলে মনেই হচ্ছে না। চারদিকে আলোর রোশনাই।

এখানেই থামাও, আমরা নেমে পড়ি।

লরি থামল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

দীপু আর তপু রাস্তার ওপর নেমে দাঁড়াল।

লরিটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

চল, গঙ্গার জলে মুখ হাত ধুয়ে নিই। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, সেগুলোও মোছা দরকার।

দুজনে সাবধানে ধাপ বেয়ে বেয়ে নেমে গেল।

মুখ হাত তো ধুলোই, আঁজলা করে সেই অপরিষ্কার জলই পান করল।

তারপর দুজনে ইতস্ততঃ মাল ছড়ানো জেটির ওপর বসল।

তপু বলল, এবার কোথায় যাবি?

জাহাজের মাস্তুলের দিকে চেয়ে দীপু বলল, জাহাজে চড়ে দূরে কোথাও চলে যাব।

তপু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিঠের যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠল, মনে পড়ে গেল জ্যাঠার অমানুষিক অত্যাচারের কথা।

সে বলল, ঠিক বলেছিস। অনেক দূরে চলে যাব। এদেশে আর ফিরে আসব না।

দুজনেরই দুঃখ, আজকের দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণটা একবার শুনলও না। কিছু বলতেই দিল না। অন্য দিনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু আজ তারা কোন অন্যায় করে নি। ভিখারীটাকে বাঁচাতে অবশ্য পারল না, সে আর কি করবে। পরমায়ু দেবার মালিক তারা নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করেছিল। লোক তো ধারেকাছে অনেক জমেছিল, শুধু তারা দুজনেই তোড়জোড় করে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে।

পৃথিবীর কোন লোক এমন কাজকে অন্যায় বলবে না। বইয়ের পাতায় পাতায় পরোপকারের আদর্শের ব্যাখ্যা থাকে। ক্লাসে শিক্ষকেরা নীতির কত কথা বলেন, অথচ নিজেদের জীবনে এসব করতে যাওয়ার ফল প্রহার।

তপু বুঝতে পারল তার দুটি চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল, একটু ঘোরাফেরা করে দেখি।

এক জেটি থেকে বেরিয়ে দুজনে পাশের জেটিতে গিয়ে ঢুকল। এখানেও একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। জেটিভর্তি নানারকমের কলকবজা। বড় বড় যন্ত্রপাতি।

একেবারে কোণের দিকে গোল গোল লোহার বাটি। বিরাট আকারের। ওপরে অর্ধেক ঢাকা ডালা।

দীপু উঁকি দিয়ে বলল।

ঢুকতে পারবি এর মধ্যে?

তপুও ঝুঁকে একবার দেখল। দীপুর দিকে চেয়ে বলল।

তারপর?

তারপর দুজনে জাহাজে উঠব।

সেকি?

দেখ না। আমি আগে উঠি, তারপর তুই উঠিস।

এদিক ওদিক চেয়ে দীপু ডালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কুলিরা জেটির ওপর কেউ নেই। রাস্তার ওপর জটলা করছে।

খুব সাবধানে তপুও ঢুকে পড়ল।

একটুও শব্দ না করে।

[ক্রমশঃ]
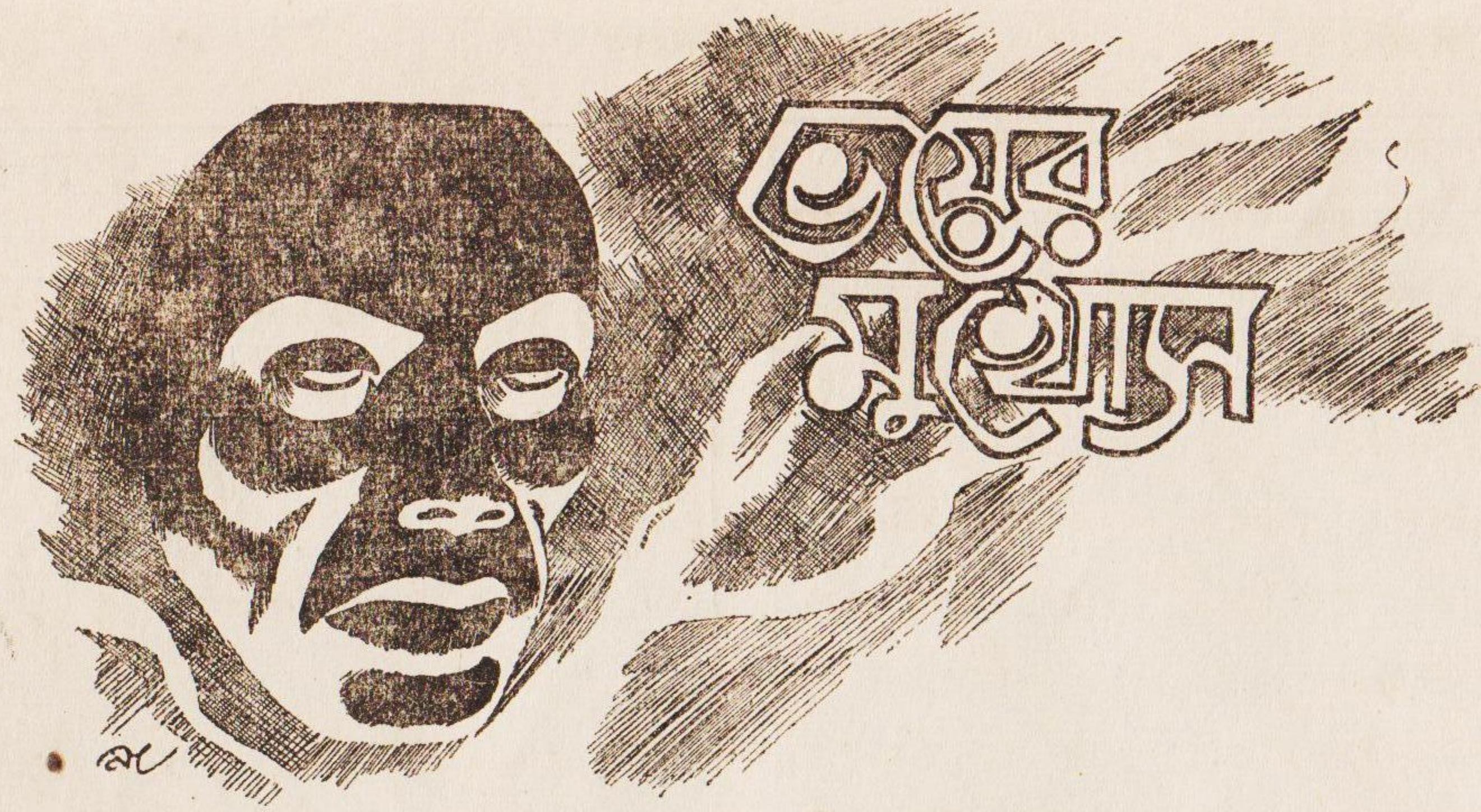
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভিতরে অনেকটা জায়গা।

দুজনে গুটিসুটি হয়ে শুতে কোন অসুবিধা হল না।

বরং বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচল।

দুজনে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তপুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সবসুদ্ধ কে যেন তাদের শূন্যে তুলছে।

প্রথমে সে মনে করল বুঝি ভূমিকম্প, দীপুকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই দীপু, দীপু, ভূমিকম্প হচ্ছে।

দীপু একটা হাত তপুর মুখের ওপর চেপে ধরে বলল।

চুপ, চেঁচাস নি। ভূমিকম্প নয়।

তবে ?

ক্রেনে করে আমাদের জাহাজে ওঠাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ জেগেছি, সব দেখেছি। যেমন শুয়ে ছিলি, তেমনই শুয়ে থাক।

তপু শুয়েই ছিল। দীপুর কথায় আরো সরে এসে কুঁকড়ে শুয়ে রইল, দু হাত দিয়ে দীপুকে জাপটে ধরে।

বড় বাটিটা খুব দুলছে। মনে হল এদেশের মাটি থেকে দীপু আর তপুকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। সব মায়া, সব সম্পর্ক কাটিয়ে।

খুব জোর একটা শব্দ হল। মনে হল বাটিটা মাটির ওপর কে যেন আছড়ে ফেলল।

দীপু আর তপুর শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল।

বাইরে কুলির স্তিমিত কোলাহল, লোহার চেনের আওয়াজ।

দুজনেরই অদম্য ইচ্ছা হল উঠে একবার বাইরের অবস্থাটা দেখবে, কিন্তু অনেক কষ্টে কৌতূহল দমন করল।

এখন ধরা পড়ে গেলেই সব মাটি। এই ক্ষতবিক্ষত শরীরের ওপরই আবার হয়তো প্রহার চলবে। দুজনকে টেনে নামিয়ে দেবে জেটির ওপর।

এত রাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ি ফিরে গেলেও সেখানে কি ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, তাও তাদের অজানা নয়।

মনে হল চাকার ওপর বসিয়ে বাটিটাকে কারা যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গড়গড় করে শব্দ।

আবার ঘটাং করে আওয়াজ।

এবার ফাঁক দিয়ে খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বোধ হয় রেলিংএর ধারে বাটিটা রেখেছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দও শোনা যাচ্ছে

একটু একটু করে বাইরের হট্টগোল কমে গেল। ঘুম নেমে এল দীপু আর তপুর চোখে।

একসময়ে অনেকগুলো লোকের কথা বলার আওয়াজে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। মনে হল, নিজেদের বিছানাতেই বুঝি শুয়ে আছে। কিন্তু এত হট্টগোল কিসের। আবার কেউ লরি চাপা পড়ল নাকি, যে জন্য লোকেদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে।

দুজনে প্রায় একসঙ্গেই চোখ খুলল।

দেখল, ডালার ফাঁকে গোটা তিন চার মুখ উঁকি দিচ্ছে।

ছোট ছোট চোখ, শুকনো কঠিন চেহারা, মাথায় সাদা টুপি।

দীপু আর তপু উঠে বসল।

কে তোমরা ? এর মধ্যে এলে কি করে ?

পরিষ্কার বাংলা ভাষা। উচ্চারণে একটু জড়তা আছে, কিন্তু বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

কি ? কথা বলছ না কেন ? বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস।

ঢোকা যত সহজ ছিল, বেরিয়ে আসা মোটেই তত সহজ নয়। বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়েই দীপু আর তপু সেটা বুঝতে পারল।

বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোও বোধ হয় বুঝল।

একজন লোহার মতন শক্ত দুটো হাত বাড়িয়ে দীপুকে ধরল, তারপর তাকে টেনে বের করে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল।

আবার সেইভাবে তপুকেও বাটি থেকে বাইরে নিয়ে এল।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়েই দুজনে অবাক্।

চারদিকে শুধু জল আর জল। গঙ্গার মত ঘোলাটে কাদা জল নয়, ফিকে সবুজ জলের রঙ। মাঝারি আকারের ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের ধাক্কায় সাদা ফেনার সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও স্থলের চিহ্নমাত্র নেই।

বিরাট জাহাজ। মাস্তুলে নিশান উড়ছে। কালো একটা চোঙের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে।

ডেকের ওপর সার দিয়ে দাঁড়ানো একদল লোক। সবার পরনে একই রঙের পোশাক। হাতে লম্বা ঝাড়ু। কোণের দিকে অনেকগুলো লাল রঙের বালতি।

যে লোকটা ওদের তুলেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল।

কই বললে না কে তোমরা? এর মধ্যে কি করে এলে?

দীপু একবার সকলের মুখের দিকে দেখে নিল, তারপর বলল, আমার নাম দীপক, আর ওর নাম তপেন। আমরা দুই ভাই।

দুই ভাই, তা এর মধ্যে কি করে এলে?

জেটিতে যখন এগুলো রাখা ছিল, তখন আমরা এর মধ্যে ঢুকেছি।

কেন?

এ পর্যন্ত বলতে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এবার কি বলবে।

কি করে বলবে, বাড়িতে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিল। এ দেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল।

দীপুকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা ধমক লাগাল।

কি, চুপ করে আছ যে? কথা বল।

তপু এতক্ষণ চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালচাল দেখছিল, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল।

আমাদের কেউ কোথাও নেই। শুধু এক সৎমা আছে, ভীষণ নির্যাতন করে। বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

কয়েকদিন আগেই তপু একটা গল্পের বই পড়েছিল। তাতে এক সৎমার অত্যাচারের কাহিনী ছিল। সেটা মনে পড়ে গেল।

মনে হল লোকটার মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু যেন সরল হল। চোখের ভাবও কিঞ্চিৎ করুণ।

কিন্তু এভাবে মালের জাহাজে লোক যাওয়ার নিয়ম নেই।

এ কথার দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে লোকগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জটলা করছে নিজেদের মধ্যে।

একটু পরে সেই লোকটাই এগিয়ে এল। বলল।

চল, তোমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে হবে।

আগে আগে দীপু আর তপু, পিছনে জন তিনেক লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ডেকের ওপর আবার একটা ডেক। তার মাঝখানে সাদা রঙের ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সবাই আরো ওপরে উঠল।

একপাশে জড়াজড়ি করে দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে। [পৃষ্ঠা ২৬৮

সিঁড়ির শেষে ছোট একটা ঘর। গোল কাঁচের জানলা। ঝকঝকে তকতকে ব্রাসের হ্যাণ্ডেল দরজার। দরজার গোড়ায় মোটা পাপোশ।

একটি লোক বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

সাব। সাব।

দরজা খুলে গেল।

দীর্ঘ চেহারার একটি লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

হাঁসের পালকের মতন সাদা ধবধবে পোশাক। সার সার বোতাম বসানো। মাথায় হেলমেট ধরনের টুপি।

এই তাহলে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন ভ্রূ কুঁচকে বলল।

কি হয়েছে ?

মেসিন কভারের মধ্যে দুটো ছেলে, সাব।

কি ?

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর ।

কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল কেবিনের চৌকাঠ পেরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে গেল।

একপাশে জড়াজড়ি করে দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে।

আরে, এ তো একদম বাচ্চা।

ক্যাপ্টেন হাতের ইশারায় দুজনকে কাছে ডাকল।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কে তোমরা ? জাহাজে চড়েছ কেন ?

দীপু আর তপুকে কিছু বলতে হল না। দলের লোকটাই বলল, এরা বুঝি দুই ভাই সাব। বাড়িতে মার অত্যাচারের জন্য পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু জাহাজে উঠলে জাহাজের ভাড়া দিতে হবে।

তপু আর দীপু হিসাব করল।

তপুর পকেটে আট আনা আছে, আর দীপুর পকেটে একটা সিকি। টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচানো। একজনের কাছে কত আছে. আর একজনের জানা।

তাই তপু বলল।

আমাদের কাছে বারো আনা আছে। এতে আপনার জাহাজের ভাড়া হবে ?

রাগ করতে গিয়েও ক্যাপ্টেন হেসে ফেলল।

ক্যাপ্টেন বাঙালী নয়, কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারে। ভাঙা ভাঙা বাংলা। বুঝতেও পারে।

হাসি চেপে বলল।

এ জাহাজ প্রথমে রেঙ্গুন যাবে। এক একজনের ভাড়া ডেকে পঁচিশ টাকা। দিতে পারবে ?

প্রায় একসঙ্গে দীপু আর তপু মাথা নাড়ল।

না।

তাহলে ?

তাহলে কি হবে দীপু তপুর জানা নেই। কি নিয়ম জাহাজের ? জলে ফেলে দেয় বিনা টিকেটের যাত্রীদের ?

যা ইচ্ছা করুক। এভাবে আর পারছে না। ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে। যাই

করুক. মেরে ফেলে দিক, জলে ফেলুক, তার আগে দুজনকে পেট ভরে অন্ততঃ খেতে দিক। তা না হলে, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালাতেই দুজনে মারা যাবে।

কি ব্যাপার, ভিড় কিসের এত ?

পিছন থেকে ভারি গলার আওয়াজে চমকে দীপু আর তপু মুখ ফেরাল।

বেশ মোটাসোটা চেহারা, গোলগাল মুখ, মাথাটা ডিমের মতন মসৃণ। একগাছা চুল নেই। চোখে চশমা।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিল।

এই যে ডাক্তার, আপনার দেশের লোকের কাণ্ড দেখুন।

কি হল ?

ডাক্তার ঠিক দীপু আর তপুর পিছনে এসে দাঁড়াল।

রাত্রিবেলা চুপিচুপি কখন মেসিন কভারের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। বিনাভাড়ায় জাহাজ চড়বার শখ।

ডাক্তার চোখ ফিরিয়ে দীপু আর তপুকে দেখল, তারপর বলল।

আমাদের দেশের ছেলেরাই তো এসব করে। পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে, ময়ূরপঙ্খী ভাসায় ঢেউয়ের বুকে, গুলির সামনে বুক পেতে দেয়। কিন্তু এরা দেখছি নিতান্ত বাচ্চা।

কিন্তু মাঝদরিয়ায় এদের নিয়ে কি করা যায় ?

উপস্থিত এদের চেহারা দেখে যা বুঝছি, অনেকক্ষণ বোধ হয় পেটে কিছু পড়ে নি। এদের কিছু খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল, তারপর ?

তারপর আর কি রেঙ্গুনে পৌঁছবার পর ফিরতি জাহাজে যাদের বাছা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কই, এস তোমরা আমার সঙ্গে।

ডাক্তারের পিছন পিছন দীপু আর তপু সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

জাহাজের সামনের দিকে মাঝারি সাইজের একটা কেবিন।

ঢুকেই দীপু আর তপু অবাক্ হয়ে গেল।

ভিতরে এলে মনে হয় যেন কোন সাজানো বাড়ির কামরা। জাহাজের মধ্যে আছে তা মনেই হয় না।

একদিকে ধবধবে বিছানা পাতা। দেয়াল আলমারি। গোল টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার।

ডাক্তার বিছানার ওপর বসল। তার নির্দেশে দীপু আর তপু দুটো চেয়ারে বসল।

নাম কি তোমাদের বল তো এইবার।

কি জানি কেন, বোধ হয় ডাক্তারের কথা বলার ভঙ্গীতে, দীপু আর তপু দুজনেরই

মনে হল যেন নিরাপদ্ একটা আশ্রয়ে এসেছে। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। এমন একটা মানুষের কাছে নিশ্চিন্তে মনের কথা বলা যায়।

তাই দীপু বলল, আমার নাম দীপক সেন, ওর নাম তপেন সেন। তপেন আমার খুড়তুতো ভাই।

তা বেশ তপেনবাবু, মাঝরাত্রে ওভাবে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে গেলে কেন?

তপু ভেবেছিল ডাক্তারের কাছে সত্যি কথাটা বলবে, কিন্তু একটু ভেবেই সাবধান হয়ে গেল।

কিছু বলা যায় না, সকলের কাছে এক ধরনের কথা বলাই ভাল। এক একজনের কাছে এক এক রকমের কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। কেউই তাদের বিশ্বাস করবে না।

তাই সৎমার নির্যাতনের কথাটাই আবার বলল।

কিন্তু বিদেশে গিয়ে তোমরা করবে কি? লেখাপড়া এমন জান না যে চাকরি করবে। হাতে কলমে কোন কাজ জান না যে কারখানায় কাজ পাবে।

তপু বলল, আমরা অত কথা কিছু ভাবি নি। রাগের মাথায় বেরিয়ে এসেছি।

এমন সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল।

তার হাতে একটা ট্রে। তাতে দু কাপ দুধ, অনেকগুলো পাঁউরুটির টুকরো, দুটো ডিমসেদ্ধ আর একরাশ ফল।

লোকটা সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার আগেই দীপু আর তপু সাগ্রহে জিনিসগুলো টেনে নিল।

কিন্তু খেতে যাবার মুখেই বিপদ্।

একটু দাঁড়াও। ডাক্তারের গম্ভীর গলার স্বর।

দুজনেই চমকে উঠল। আবার কি হল? খাবার ব্যাপারে জাহাজের অন্য কোন নিয়ম আছে নাকি!

তপু তোমার হাতে লালচে দাগটা কিসের?

শুধু হাতে! অবশ্য হাতটাই দেখা যাচ্ছে। পিঠ আর বুক তো জামায় ঢাকা।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে সার্টটা টেনে খুলে ফেলল, ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দেখুন পিঠের অবস্থা। সারা পিঠ জুড়ে কালশিটে আর রক্তাক্ত আঁচড়।

দীপুর দেখাদেখি ততক্ষণে তপুও জামা খুলে ফেলেছে। তার পিঠেরও একই অবস্থা।

ঈস্! আহা, কচি ছেলেকে এভাবে কেউ মারে।

ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল আলমারি খুলে তুলো আর ওষুধ বের করল, তারপর খুব সাবধানে তপু আর দীপুর আঘাতচিহ্নের ওপর লাগিয়ে দিল। [ক্রমশঃ]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ওষুধ লাগানো হতে দুজনে খেতে বসল।

অত খাবার শেষ হতে মিনিট দশেকের বেশী লাগল না। পেটের মধ্যে যে যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছিল, সেটার উপশম হল।

এবার তোমরা বাইরের ডেকে চলে যাও। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা একটা করছি।

দুজনে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই অবাক্।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবিনে বাতি জ্বলছিল বলে কিছু বোঝা যায় নি।

আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। জল এখন আর ফিকে সবুজ নয়, গাঢ় কালো। ঢেউয়ের আকার দারুণ বেড়েছে। হাওয়ার বেগের জন্য এগোনোই দুঃসাধ্য। ঠেলে যেন পিছনে হটিয়ে দিচ্ছে।

একটা লোক দৌড়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ওদের দেখে বলল, নীচে চলে যাও তোমরা। ভীষণ ঝড় উঠছে।

নীচে? নীচে আর কোথায় যাবে? এ জাহাজের কোথায় কি আছে কিছুই তাদের জানা নেই। জানার অবকাশই পায় নি।

ছুটতে ছুটতে তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে এল। একেবারে জাহাজের খোলে।

নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশ্রী একটা গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে যাবার দাখিল।

একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একগাদা ছাগল বাঁধা রয়েছে। এদিকে খাঁচার ওপর খাঁচা। তার মধ্যে মুরগী, হাঁস আর কুঁকড়ো।

গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

কিন্তু ওপরে ওঠবারও উপায় নেই। বোঝা গেল জাহাজটা বেশ দুলছে। একবার এদিক থেকে ওদিক, আর একবার ওদিক থেকে এদিক।

দোলার সঙ্গে পাঁঠা, মোরগ, হাঁসের ঐক্যতানে কানে তালা ধরবার যোগাড়।

দুজনে নাক চেপে সিঁড়িতেই বসে পড়ল।

একটু আগে যে সব সুখাদ্য পেটে গিয়েছিল, সেগুলো পাক দিয়ে উঠতে লাগল। গন্ধে আর জাহাজের দোলানিতে।

দু হাতে মুখ চেপে ধরে দুজনে বমির বেগ সামলাল।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর, একভাবে চলল, তারপর মনে হল জাহাজ যেন একটু সামলে নিল। বোধ হয় ঝড়ের বেগ কম।

ওরা সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

সমস্ত ডেকটা ভিজে গিয়েছে। বোধ হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল।

এক জায়গায় কুণ্ডলীপাকানো ম্যানিলা দড়ি ছিল, দুজনে তার ওপর গিয়ে বসল।

সকালের মতন একদল লোক লম্বা ঝাড়ু হাতে এসে হাজির হল। ঝাড়ু দিয়ে ঠেলে ঠেলে জল ফেলে দিতে লাগল রেলিংয়ের ফাঁকে।

একটা লোক কাছে আসতে তপু জিজ্ঞাসা করল।

খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি ?

ঝাড়ু রেখে লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল।

বৃষ্টি কোথায় ? এ তো ঢেউয়ের জল।

ঢেউ ?

হ্যাঁ, ঝড়ের সময় ঢেউয়ের সাইজ তিনতলা চারতলা পর্যন্ত হয়। এদিক দিয়ে ঢেউ উঠে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একেবারে ডেক ভাসিয়ে।

বিস্ময়ে দীপু আর তপু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরেই দমকলের ঘণ্টার মতন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল।

দীপু আর তপু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ, জাহাজে আবার আগুন লাগল নাকি ?

সবাই ঝাড়ু বালতি সরিয়ে সার হয়ে দাঁড়াল তারপর চলতে শুরু করল।

দীপু আর তপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন বলল।

চল, খাবার ঘণ্টা পড়েছে। খেতে যাবে না

ওটা দমকলের ব্যাপার নয়, খাবার ঘণ্টা। দীপু আর তপু একটু আশ্বস্ত হল। দুজনে আর সকলের পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করল।

এভাবে দু'দিন দু'রাত কাটল।

শোবার জন্য দুজনে একটা কেবিন পেয়েছে। ডাক্তারের কেবিনের মতন অমন চমৎকার সাজানো নয়। শুধু দুটো বিছানা, আর একটা আয়না।

ওদের পক্ষে এই যথেষ্ট।

তিনদিনের দিন সকাল থেকেই সারা জাহাজে বেশ একটু চাঞ্চল্য। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সবাই চোখের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে জলের ওপারে চেয়ে চেয়ে কি দেখছে।

জলের রং আর ঘন নীল নয়, আবার ফিকে সবুজ।

ক্যাপ্টেনও চোখে দুরবীন লাগিয়ে নিজের ছোট ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ ক'দিনে ওরা শিখে গেছে। যে লোকগুলো জাহাজের কাজ করে, তাদের সারেং বলে।

একজন সারেংকে ডেকে তপু জিজ্ঞাসা করল।

কি হয়েছে ? তোমরা সবাই ওরকম করে কি দেখছো ?

সারেং হাসল।

একটু পরেই মাটি দেখা যাবে। বর্মার মাটি। মংকি পয়েন্ট। ওই দেখ, ডাঙা আর দূরে নেই।

দীপু আর তপু চেয়ে দেখল।

রেলিংয়ের পাশে পাশে বিরাট আকারের সাদা সাদা পাখী উড়ছে। ঠিক যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

কি ওগুলো ?

ওই তো সি-গাল পাখী। ওরা ডাঙার খবর নিয়ে আসে। সেইজন্য ওদের মারা বারণ। কেউ মারতেও পারবে না, ধরতেও নয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রেলিংয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ওই তো কালো দাগ। জল শেষ হয়ে, মাটির রেখা।

দীপু আর তপু কিন্তু চোখ কুঁচকে সেদিকে চেয়েও কিছু দেখতে পেল না।

তবে একটু পরেই ফিকে সবুজ জল ঘোলাটে হয়ে এল। কাদাগোলা।

এবার সবুজ রেখাও স্পষ্ট দেখা গেল।

গাছপালাঢাকা মাটির চিহ্ন।

বিরাট একটা আর্তনাদ করে জাহাজটা দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে।

কি হল ?

তপু প্রায় চীৎকার করে উঠল।

কি হবে ?

জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল যে ?

সারেং হাত নেড়ে দীপু আর তপুকে ডাকল।

এদিকে এস। ওই দেখ।

দীপু আর তপু এদিকের রেলিংএ এসে দাঁড়াল।

ঠিক জাহাজের পাশে একটা সাদা মোটরলঞ্চ এসে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জলের ওপর।

সারেং বলল, ওটা পাইলটের লঞ্চ। ওই দেখ সাদা পোশাক পরা পাইলট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে।

কি করবে পাইলট ?

সমুদ্রের পথঘাট ক্যাপ্টেনের সব জানা। জাহাজ নিয়ে আসতে তার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু নদীতেই মুশকিল। কোথায় জল কম, কোথায় জলের চোরাটান আছে সে সব সম্বন্ধে পাইলট ওয়াকিবহাল। তাই মোহানা থেকে রেঙ্গুন বন্দর পর্যন্ত এই পাইলটই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

এটা কি নদী ?

এর নাম লেইং। ইরাবতীর একটা শাখা।

সারেংয়ের কথা শেষ হবার আগেই জাহাজ চলতে শুরু করল। জল কেটে কেটে।

এখন দু'পাশের তীরভূমি বেশ স্পষ্ট। লোকজনও দেখা গেল। দু'একটা কলকারখানা।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজ জেটিতে নোঙর ফেলল।

জাহাজ থামতেই ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়াল।

শোন, তোমরা যেন নেমো না। অচেনা জায়গা, বিপদে পড়বে। এখানে জাহাজ দিন দুয়েক থাকবে। মাল খালাস করে সিঙ্গাপুর চলে যাবে। তার আগে জাহাজ কোম্পানির আফসে তোমাদের দিয়ে আসব। আজ বৃহস্পতিবার, শনিবার ফেরার জাহাজ

আছে। এস এস এ ডা ভা না কলকাতায় ফিরে যাবে, সেই জাহাজে তোমাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করব।

দীপু আর তপু কোন কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

ডাক্তার সরে যেতে দীপু তপুকে বলল।

তপু, যে রকম করেই হোক এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের পালাতে হবে, না হলে ভীষণ বিপদ্।

কি বিপদ্ ?

কি বিপদ্ বুঝতে পারছিস না ? আরো দুটো কঞ্চি বাবা আমাদের পিঠে ভাঙবে। বাড়ি থেকে পালানোর কি শাস্তি ভাবতে গেলেই তো বুক কেঁপে উঠছে।

তার পরনে কালো জামা,··· [পৃষ্ঠা ৩১০

কিন্তু এখানে কোথায় যাব ? কেউ তো আমাদের চেনে না।

তপু যেন একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

এই জাহাজেই কি কেউ আমাদের চিনত ? একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল তো ?

আর কোন কথা হল না। মাল নামানো শুরু হল। কুলির দল লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের ওপর উঠল। কতকগুলো সারেং সেজেগুজে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

দুই ভাই রেলিংয়ের ধারে বসে বসে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে চা খাওয়া সেরে দুজনে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। ক্যাপ্টেন বেরিয়েছে। ডাক্তার ওপরের ডেকে বসে বই পড়ছে।

চল, নামি।

দুজনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে এসে দাঁড়াল।

জেটির বাইরে সোজা রাস্তা। দু'ধারে আলো জ্বলছে। জেটির ওপর তখনও কিছু মাল পড়ে রয়েছে।

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দীপু বলল, ওই দেখ বর্মী যাচ্ছে

পরনে কালো ছোট কোট, রঙিন লুঙ্গি, পায়ে চটি একটা লোক হনহন করে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল।

তপু বলল, এ তো আবার আর একটা মুশকিল।

কি ?

এদের ভাষাও তো বুঝব না। এক কথা বললে আর এক কথা শুনবে। মহা ঝামেলা হবে তাই নিয়ে।

দীপু বলল, এগিয়ে চল। এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো নিরাপদ্ নয়। ডাক্তার একবার দেখতে পেলে লোক দিয়ে ধরে ফেলবে।

ছোট একটা পার্ক। দুজনে পার্কের মধ্যে ঢুকল

কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল।

ঝাঁকড়া গাছের নীচে একটা বেঞ্চ। জায়গাটা অন্ধকার। লোকটাকে দেখা গেল না। তার গলার স্বর শোনা গেল।

কে তোমরা ?

দুজনে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

বেঞ্চ থেকে যে লোকটা এগিয়ে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল, তার পরনে কালো জামা, কালো ঝলঝলে প্যান্ট। গোঁফজোড়া সরু হয়ে দু'পাশের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। চোখের বালাই নেই। নাকের অবস্থাও তাই।

লোকটা চীনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু চীনে এত সুন্দর বাংলা বলছে কি করে ?

দীপু বলল।

আমরা বাঙালী। কলকাতা থেকে জাহাজে করে বেড়াতে এসেছি।

এখানে কোথায় যাবে ?

কোথায় যাব এখনও ঠিক করি নি। এখানে আমাদের জানাশোনা কোন লোক তো নেই।

তোমাদের সঙ্গে কে আছে ?

কেউ নেই। আমরা দুজনেই বেরিয়েছি

চীনেটি আরো কয়েক পা এগিয়ে দীপু আর তপুর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দুটো হাত রাখল দুজনের কাঁধে।

হেসে বলল, চাকরি করবে তোমরা ?

ওরা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল।

তপু বলল, চাকরি পেলে আর কে না করে, কিন্তু আমাদের মতন এত ছোট ছেলেকে কে চাকরি দেবে ?

চীনেটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। একসময়ে হাসি থামিয়ে বলল।

ছোট ছেলেদের জন্যও চাকরি আছে বৈকি। এমন চাকরি আছে যা কেবল ছোটদেরই উপযুক্ত। তোমরা করবে কিনা বল ?

দীপু বলল, বললাম তো করব।

বেশ, তাহলে এস।

চীনে এগিয়ে চলল। দীপু আর তপু তাকে অনুসরণ করল।

পার্কের বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

চীনে কাছে গিয়ে দু'হাতে তালি দিল। গাড়োয়ানটা একটু দূরে ছিল, ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

চীনে হাসতে হাসতে বলল, উঠে পড় খুদে ভাইরা। তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

প্রথমে দীপু আর তপু তারপর চীনেটি গাড়িতে উঠে বসল।

দীপু আর তপু পাশাপাশি। উলটোদিকে চীনে।

গাড়ি ছাড়তে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা তুমি তো জাতে চীনে, তাই না ?

চীনে হাসতে হাসতে বলল, আমার নাক দেখে বুঝতে পারছ না? যখনই দেখবে এক চোখের জল গড়িয়ে আর এক চোখে পড়ছে, তখন বুঝবে লোকটা চীনে।

চীনের কথায় দীপু আর তপু দুজনেই খুব জোরে হেসে উঠল।

এবার তপু বলল।

কিন্তু এত ভাল বাংলা শিখলে কি করে ?

এবার চীনেটা আরো জোরে হেসে উঠল।

আরে আমি জাতে চীনে হলে কি হবে, কোনদিন কি আমি গেছি চীনদেশে। আমরা তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। ট্যাংরায় আমাদের চামড়ার কারখানা। আমি অবশ্য বছর কুড়ি বর্মায় এসেছি ব্যবসা করতে।

তোমার কিসের ব্যবসা

ব্যবসা কি আমার একটা। নানারকমের ব্যবসা। তোমরা থাকতে থাকতেই সব জানতে পারবে। তোমাদের মতন সেয়ানা ছেলেই তো খুঁজছিলাম এতদিন।

সেয়ানা বলাতে দীপু আর তপু দুজনেই খুব খুশী হল।

দীপু বলল, আমাদের মাইনে কিন্তু একটু বেশী দিতে হবে। আমাদের এই একটি সার্ট আর একটি প্যাণ্ট সম্বল। জামা কাপড় কিনতে হবে আমাদের।

তাছাড়া কিছু টাকা আমরা দেশেও পাঠাতে চাই।

তপুর হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। বিধবা মাকে কিছু টাকা পাঠানো দরকার।

গাড়ির মধ্যেটা অন্ধকার। চীনেটা হেসে উঠতেই তার দুটো সোনাবাঁধানো দাঁত চকচক করে উঠল।

চীনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সব হবে, সব হবে। এখন নাম, আমরা এসে গেছি।

(ক্রমশঃ)

পেতে হলে খাটতে হয়

কোন একটা জিনিস কিনতে হলে সেই জিনিসের মূল্য অনুপাতে একটা শ্রমিককে কত সময় খাটতে হয় জান—

অর্ধ কিলো রুটির জন্য—৫½ মিনিট
পশমী স্যুটের জন্য—২৩ ঘণ্টা
সিনেমার টিকেটের জন্য—৩৬ মিনিট
রেফ্রিজারেটারের জন্য—৭১ ঘণ্টা
এ হিসাব আমেরিকার শ্রমিকদের

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ছোট্ট কাঠের একতলা বাড়ি। সবই অন্ধকার। কেবল একটা ঘর থেকে মিটমিটে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আশা করেছিল লোকটা যে রকম ব্যবসার ফিরিস্তি দিচ্ছিল, বাড়িটাও সেই অনুপাতে জমজমাট হবে।

বাড়ির পিছনেই নদী। অন্ধকারে গোটা দুয়েক পালতোলা নৌকার কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

এস, এস নেমে এস।

চীনেটা হাসতে হাসতে আপ্যায়ন করল।

দীপু বলল, বাড়িটা এত অন্ধকার কেন ?

আমি ছিলাম না বাড়িতে তাই অন্ধকার। এইবার আলো জ্বলবে। চলে এস তোমরা। ঠাণ্ডায় আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেক না।

দীপু আর তপু চীনের পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

একতলায় পৌঁছে চীনে বলল, ডানদিকে একটা ঘর আছে সেটাতে ঢুকে পড়। আমি বাতির বন্দোবস্ত করছি।

হাত দিয়ে অনুভব করে তপু বলল, দরজা যে বন্ধ।

অন্ধকারে চীনের হাসির শব্দ শোনা গেল।

দুর বোকা ছেলে, বন্ধ হবে কেন ? ভেজানো আছে, ঠেললেই খুলে যাবে।

সত্যিই তাই। তপু হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে দীপু আর তপু ভিতরে ঢুকল।

তারপরই চমকে উঠল।

পিছনে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল বাইরে থেকে যেন শিকলও তুলে দেওয়া হল।

দীপু আর তপু দুজনেই দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আরে, দরজা বন্ধ করলে কেন? শুনছো, দরজা খোল।

কোন উত্তর নেই। ফাঁকা ঘরে ওদের চীৎকারের প্রতিধ্বনিই ফিরে এল।

দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

খুট করে একটা শব্দ।

দীপু আর তপু ফিরে দাঁড়াল।

পিছনের কাঠের দেয়ালে চৌকো একটা গর্ত। তার মধ্যে চীনের মুখটা দেখা গেল। কাছে বোধ হয় বাতিও রয়েছে কারণ সেই বাতির আলো চীনের মুখের ওপর এসে পড়েছে।

পৈশাচিক একটা হাসি, তারপরই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

খোকাবাবুরা বিশ্রাম কর, একটু পরে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীপু চীৎকার করে উঠল।

এভাবে আমাদের বন্ধ করে রাখলে কেন? কি মতলব তোমার?

চীনে দুটো চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল।

ছেলেমানুষ, বিদেশে পথ হারাবে, তাই ভাল জায়গায় রেখে দিয়েছি।

আমরা চেঁচাব। পুলিসে খবর দেব।

দীপু আর তপু দুজনেই প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল।

কেন চেঁচিয়ে নিজেদের গলা ভাঙবে? এ ঘরের আওয়াজ বাইরে যায় না।

বদমায়েশ কোথাকার, তোমাকে খুন করব।

শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে গিয়ে দুজনে দেখল, চীনের মুখটা গর্ত থেকে সরে গেছে, তার বদলে ম্লানদীপ্তি একটা লণ্ঠন লোহার শিকে ঝুলছে।

সেই আলোয় কামরাটা দীপু আর তপু ভাল করে দেখল।

এক কোণে খড়ের বিছানা পাতা। এদিকে কাঠের ছোট টেবিল, নীচু দুটো টুল। মেঝেটা সিমেন্টের, কিন্তু অনেক জায়গায় সিমেন্ট উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

দীপু খড়ের বিছানার ওপর বসল।

তপু টুলের ওপর।

দীপু ক্লান্ত গলায় বলল, মনে হচ্ছে আমরা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি।

ডাকাতের পাল্লায়? তপুর কেমন একটু সন্দেহ হল, ডাকাত আমাদের ধরে কি করবে। আমাদের না আছে টাকাপয়সা, না আছে সোনার গয়না। বোধ হয় লোকটার উদ্দেশ্য অন্য।

কি উদ্দেশ্য?

আমাদের ওপর নির্যাতন করে আমাদের ঠিকানা যোগাড় করবে, তারপর জ্যাঠাকে লিখবে তোমাদের ছেলে যদি ফেরত চাও, তাহলে দশ হাজার টাকা অমুক জায়গায়, অমুক লোকের হাতে দিয়ে এস।

কিন্তু বাবা অত টাকা পাবে কোথায়?

না দিতে পারলে আমাদের হয়তো কেটে ফেলবে।

তাহলে উপায়?

উপায়, বলা যে আমাদের তিনকুলে কেউ নেই। কে উদ্ধার করবে টাকা দিয়ে।

তাতে কি রেহাই পাব?

কি জানি, লোকটার কি মতলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নদী খুব কাছে। জলের ছলাৎ ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দীপু আর তপু দুজনেই দুর্দান্ত ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না। বয়সের চেয়ে অনেক সাহসী।

কিন্তু এই থমথমে পরিবেশে, নিজের দেশ থেকে এত দূরে একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল।

আজ রাতটা হয়তো কিছু করবে না, কাল ভোরে চীনে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন তার মতলব বোঝা যাবে।

ঠিক দীপুর মাথার কাছে একটা শব্দ হতে সে লাফিয়ে খড়ের বিছানা থেকে উঠে এল।

মাথার ওপর একটা ফোকর, তার মধ্য দিয়ে একটা টিফিন কেরিয়ার টেবিলের ওপর নেমে এল।

বোঝা গেল একটা বাঁকানো তারের সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারটা আটকানো ছিল। টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ারটা বসিয়েই তারটা ফোকর দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল।

দুজনেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

তাদের মনে হয়েছিল অদৃশ্য জায়গা থেকে চীনেটা হয়তো খাবার নির্দেশ দেবে।

দশ মিনিট কেটে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

দীপু বলল, আয় দেখি টিফিন কেরিয়ারে কি আছে।

সে এগিয়ে টিফিন কেরিয়ার খুলে বাটিগুলো টেবিলের ওপর সাজাল। দুটো বাটিতে

লম্বা লম্বা চালের ভাত। দুটো বাটিতে থোড়ের ঝোল। আর একটা জায়গায় দুটো পেঁয়াজ।

খাবারের চেহারা দেখে চোখে জল এল। ক'দিন জাহাজে খাওয়াটা বেশ ভালোই হচ্ছিল। সেরকম জিনিস তারা বাড়িতেও কোনদিন চোখে দেখে নি।

তপু বলল, আয়, আরম্ভ করে দিই।

হাত বাড়িয়েও দীপু হাত গুটিয়ে নিল।

এতে বিষ মেশানো নেই তো?

তপু বলল, এখন আমাদের মেরে ফেলে চীনের লাভ কি? মেরে ফেলবার জন্য নিশ্চয় কষ্ট করে এতদূর নিয়ে আসে নি। আমরা যদি ওর উদ্দেশ্য সফল না করতে পারি, তখন মেরে ফেলার কথা ভাববে।

আর দ্বিধা না করে দুজনে খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ করে দুজনে খড়ের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

শরীর খুবই পরিশ্রান্ত, কিন্তু উদ্বেগের জন্য ঘুম এল না। দুজনেই এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

একসময়ে কামরা অন্ধকার হয়ে গেল। বোধ হয় লণ্ঠন নিভে গেল কিংবা সেটাকে কেউ ফুটো দিয়ে টেনে ওপরে তুলে নিয়েছে।

রাত গভীর হতে, সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কেবল নদীর জলের আছড়ানির শব্দ একটু একটু করে জোর হতে লাগল।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু একটা হাসির আওয়াজে তপু জেগে উঠল।

দীপু, দীপু।

খুব ফিসফিস করে তপু ডাকল।

বল, আমি জেগে আছি।

দীপুর গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

হাসির আওয়াজ শুনতে পেলি?

হ্যাঁ।

কেউ বোধ হয় এ ঘরে ঢুকবে।

কি জানি বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আবার হাসির শব্দ। একজনের নয়, একাধিক লোকের। মনে হল হাসির আওয়াজটা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

দীপু পিছনের দেয়ালে কান পাতল। ঠিক পিছন থেকেই যেন শব্দটা আসছে।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনের আর ঘুম এল না।

* * *

খুব জোর একটা আওয়াজ হতে দুজনেই চমকে উঠে বসল।

দরজা খোলা। ঠিক দরজার গোড়ায় চীনেটা দাঁড়িয়ে আছে।

কি, ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

দীপু চোখ মুছতে লাগল।

তপু একদৃষ্টে চেয়ে রইল চীনের দিকে।

বিনা মতলবে চীনে নিশ্চয় এসে দাঁড়ায় নি।

দীপু চেঁচিয়ে উঠল।

কেন তুমি এভাবে আমাদের আটকে রেখেছ?

দীপু আর তপু লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল।

চীনের হাসি অম্লান। হাসলে মাংসের আড়ালে দুটো চোখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাসতে হাসতেই বলল, তোমাদের একটা ভাল চাকরি দেব, তাই এখানে রেখেছি। তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে খুব উন্নতি হবে তোমাদের। ভাল জামা কাপড় পাবে, আর পকেটবোঝাই পয়সা। দু'হাতে খরচ করবে। আর কথা যদি না শোন—

না শুনি তো কি হবে?

হাসি না থামিয়ে চীনে বলল, না শোন তো—

কথা শেষ না করে সে পা দিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় করে একদিকের পার্টিশন সরে গেল। লোহার গরাদ। তার পিছনে একটা চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল।

দীপু আর তপু লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল।

ভয় নেই, ভয় নেই জোড়া খোকাবাবু, ওটা বন্ধ রয়েছে। এখন কিছু করতে পারবে
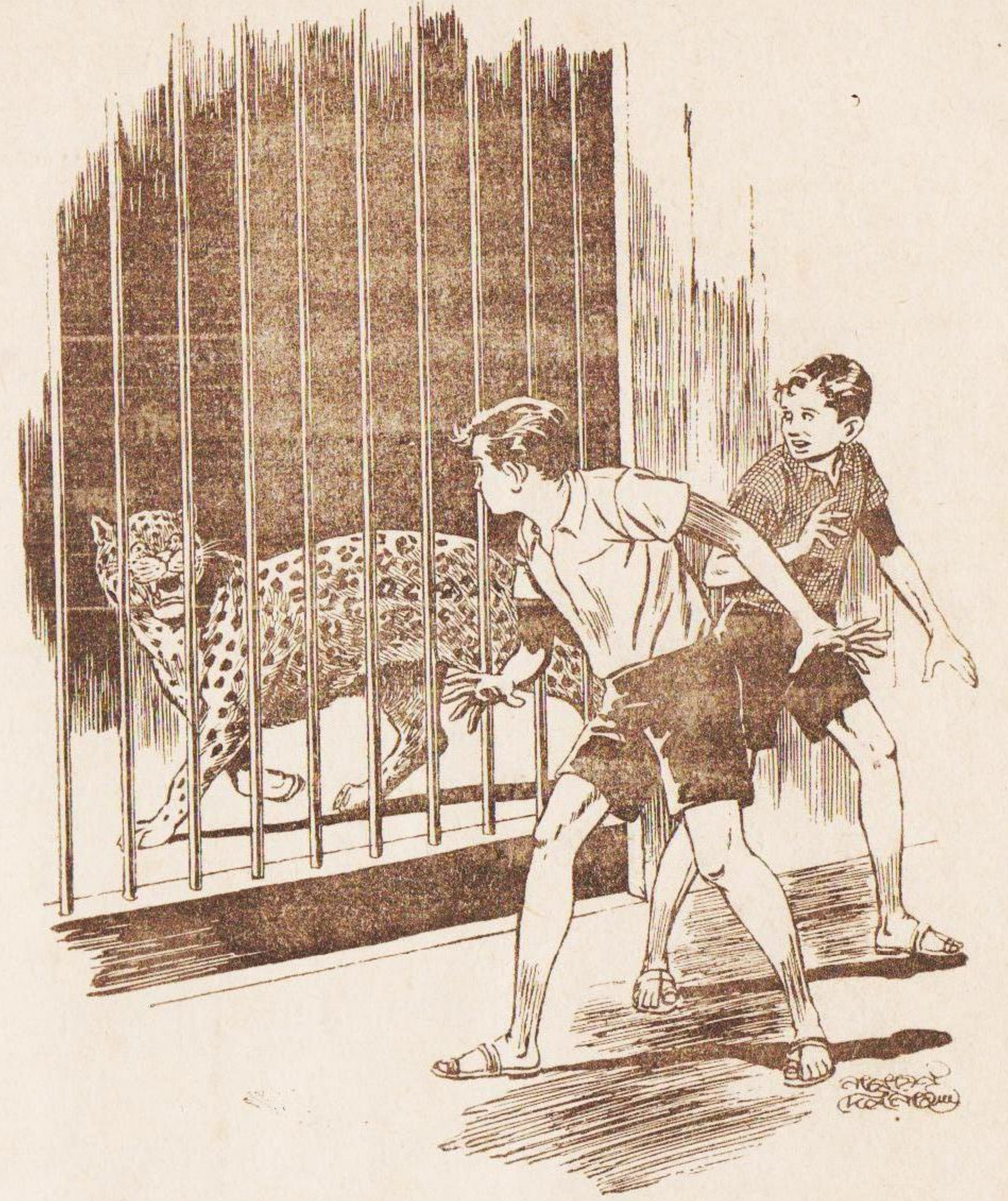
না। তবে বোতামটা আর একটু জোরে টিপলে ওই গরাদগুলোও সরে যাবে, তখন ও এ ঘরে ঢুকে পড়বে। তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

চীনের অসাধ্য কোন কাজ নেই, সেটা দীপু আর তপু বেশ বুঝতে পারল।

তপু বলল।

কি কাজ করতে হবে ?

বলব, বলব, সময়ে সব বলব। ব্যস্ত হয়ো না। তোমাদের বয়সী একটি ছেলে একবার খুব তেজ দেখিয়েছিল, হুঁ হুঁ, মাংসটা গেল লালীর পেটে, আর হাড়গুলো বস্তাবন্দী করে নদীর জলে ফেলে দিলাম। তাই বলছি, কখনও গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। তোমাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো ?

কেউ ভয়ে কোন উত্তর দিল না।

চীনে একটু বাইরে ঝুঁকে সজোরে হাততালি দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বেঁটে, কদাকার একটা লোক এসে দাঁড়াল।

চীনে তাকে খুব চেঁচিয়ে বলল।

এই চা নিয়ে আয়।

লোকটা চলে যেতে চীনে বলল, এ ব্যাটা আবার বোবা আর কালা। খুব চেঁচাতে হয় আমাকে।

তপু একবার মুখ ধোবার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিল।

চা এল, সঙ্গে আধপোড়া রুটি।

চীনেটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপু আর তপু ভাবল, এইবার চীনেটা বোধ হয় আস্তে আস্তে দেশের বাড়ির খোঁজ-খবর নেবে। ঠিকানা চাইবে। যাতে চিঠি লিখতে পারে।

কিন্তু সেরকম কিছু করল না।

শুধু বলল, আজ রাতে একটু জেগে থেক খোকারা। আজ থেকেই তোমাদের চাকরিতে লাগিয়ে দেব।

দীপু বলল।

কিসের চাকরি ?

আরে, বেশী জিজ্ঞাসা কর না। বললাম যে ভাল চাকরি। জীবনভোর চাকরি করতে হবে।

কথা শেষ করে চীনেটা হাসল।

চীনের এই হাসিতেই ভয় লাগে। এর চেয়ে যদি গালাগাল দিত কিংবা ধমক, দীপু আর তপু সহ্য করত, কিন্তু এই হাসি অসহ্য।

তপু বলল।

আমাদের চাকরিতে দরকার নেই, তুমি আমাদের জাহাজেই রেখে এস।

দূর, তা কি হয় ! আগে কেমন মজার চাকরি তাই দেখ।

চীনেটা সরে গেল।

বোঝা গেল বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালাচাবি দেবার শব্দও কানে এল।

সারাটা দুপুর একভাবে কাটল। ঠিক বারোটায় রেকাবিতে ভাত আর তরকারি এল। কয়েক গ্রাস মুখে ঠেকিয়েই দুজনে রেকাবি সরিয়ে রাখল।

ঠাণ্ডা, শক্ত ভাত। বিস্বাদ তরকারি।

দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

দুপুর কেটে বিকাল হল। বিকালের পর সন্ধ্যা।

রাতের খাওয়া শেষ করে দুজনে সবে শুয়েছে। একটু তন্দ্রার ভাব নেমেছে চোখে, এমন সময় ঝনাৎ করে দরজা খোলার শব্দ হল।

কই হে ওঠ, ওঠ, চাকরি করবে তো উঠে পড়।

দুজনে ধড়মড় করে উঠে বসল।

চীনেটা এগিয়ে এসে দু'হাতে দুজনকে ধরল তারপর আধো-অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোতে আরম্ভ করল।

[ক্রমশঃ]

অসম্ভব নয়—

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯৩, ০০০,০০০ মাইল। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা একসময়ে অসম্ভব বলে মনে হত। কিন্তু এই অসম্ভবও বর্তমান যুগে সম্ভব হচ্ছে। হয়তো বর্তমান যুগে রকেটযান সর্বত্র যাতায়াত শুরু করবে।
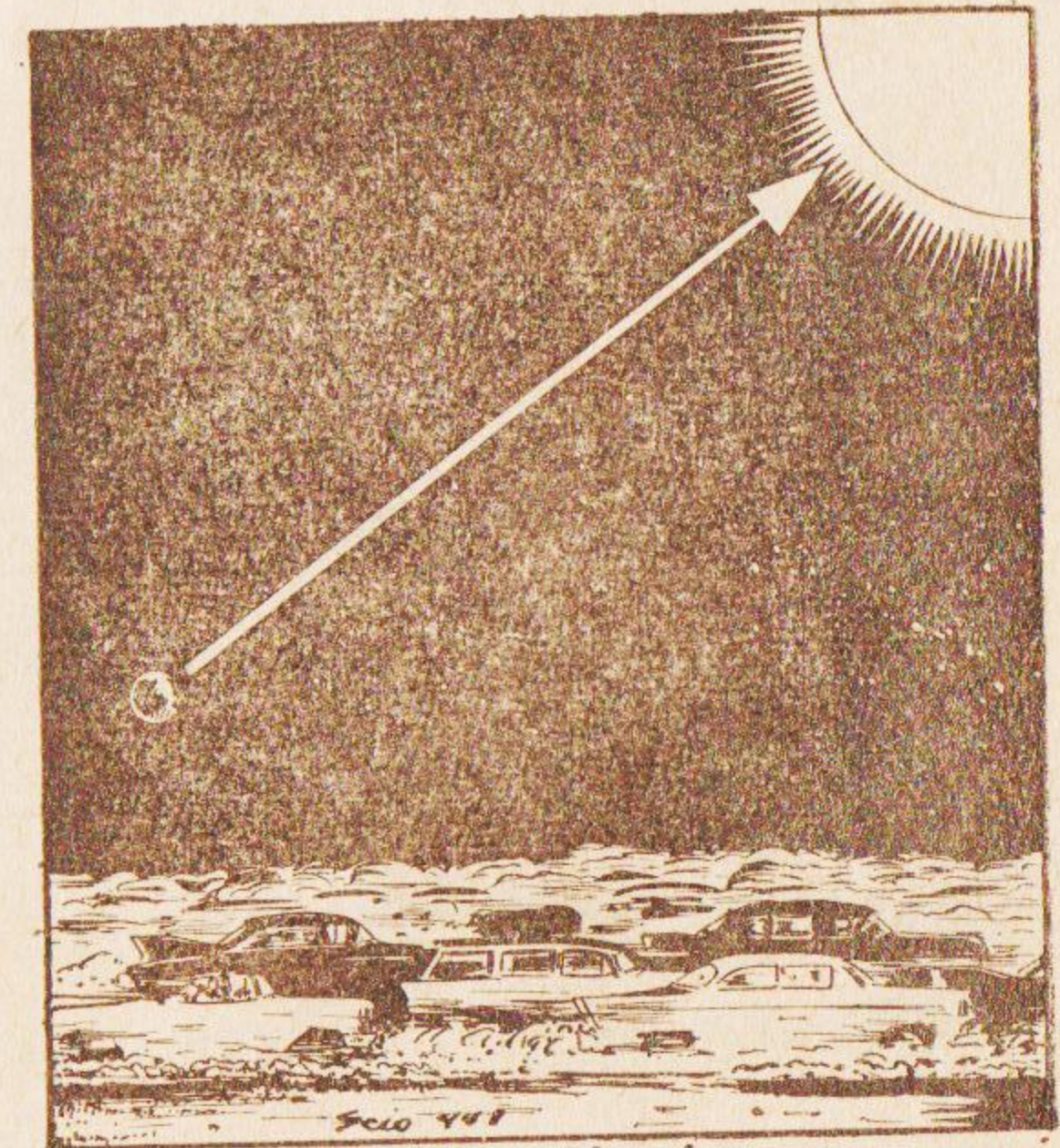
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চারপাশে ঘন আগাছা, ইটের পাঁজা, মাঝখানে সংকীর্ণ রাস্তা। খুব কাছে না গেলে দেখাই যায় না।

চীনে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খুব সাবধানে নেমে যাও।

তপু বলল, নামব কি, পথই যে দেখতে পাচ্ছি না।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

দীপু আর তপু দুজনেই দেখল, চওড়া সিঁড়ির ধাপ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে।

নামো, নামো, দেরি কর না।

তাড়া খেয়ে দীপু আর তপু নামতে শুরু করল। ঘোরানো সিঁড়ি। দু'ধারে কাঠের রেলিং। একেবারে চাতালে নেমে দুজনেই অবাক্ হয়ে গেল।

টর্চের আলোর আর দরকার নেই। চারদিকে আলোর ব্যবস্থা। দিনের মতন পরিষ্কার।

কাঠের একটা পার্টিশন। তার ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল, কাল রাতে এই হাসির শব্দই তারা শুনতে পেয়েছিল।

এবার চীনে একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল।

এস, আমার সঙ্গে। এদিক ওদিক দেখবার দরকার নেই।

এভাবে সতর্ক না করলে দীপু আর তপু হয়তো কোন দিকেই দেখত না। সোজা চলে যেত।

কিন্তু চীনের কথাতে দুজনেরই সন্দেহ হল।

তাহলে এ দিকে ওদিকে নিশ্চয় কিছু দেখবার আছে।

লাল পর্দা টাঙানো। শীতের মধ্যেও ভিতরে পাখা ঘুরছে। সেই পাখার বাতাসে মাঝে মাঝে পর্দাটা উড়ছে।

তার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল।

সামনে পাশার মতন একটা ছক ফেলা। চারদিকে চারজন বসে আছে। পরনে ছোট কোট আর রঙিন লুঙ্গি। মাথাতেও রঙিন কাপড়ের টুকরো বাঁধা।

একটা কৌটায় হাড়ের একটা ঘুঁটি নিয়ে ফেলছে আর যে জিতছে, সেই বোধ হয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠছে।

চারজনের পাশেই চারটে গড়গড়া। কেউ নলটা হাতে ধরে আছে, কেউ টানছে।

একেবারে কোণের দিকে একটা ঘরে গিয়ে চীনে চেয়ারে বসল।

তারপর দুজনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল।

এইখানে তোমাদের কাজ করতে হবে। যারা খেলছে, সেবা করতে হবে তাদের।

সেবা ?

সেবা মানে যে লোকগুলো খেলছে তাদের তরিবত করা। সময়ে চা খাবার দেওয়া, অন্য সব ফাইফরমাশ খাটা।

দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না। বুঝতেই পারল উত্তর দিয়ে কোন লাভ নেই। চীনে যা বলবে, তা করতেই হবে। অমান্য করলেই সর্বনাশ।

পরের দিন থেকেই দুজনে কাজে লেগে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজের আসল চেহারা মালুম হল। পাঁচ মিনিট অন্তর কালো চা দেওয়া, একটু দেরি হলেই লোকগুলো খেপে যেত। কাছে ডেকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক প্রহার।

কত রাত পর্যন্ত যে খেলা চলত, তার ঠিক নেই। দীপু আর তপুকে জেগে অপেক্ষা করতে হত আসরের এক পাশে।

তারপর সবাই চলে গেলে সেই বোবা আর কালা লোকটা এসে দাঁড়াত। ইঙ্গিতে দুজনকে পিছন পিছন যেতে বলত।

সেই পুরোনো কামরা, পুরোনো খড়ের শয্যা।

দিন পনেরো পরেই বিপদ্ হল।

যেটা শুধু খেলার আসর বলে দীপু আর তপু মনে করেছিল, ক'দিনেই বুঝতে পারল সেটা আসলে জুয়ার আড্ডা।

এক একজন খেলোয়াড়ের পাশে স্তূপীকৃত নোট। খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই নোট হাত বদল করে। যে হারে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, এবং তার সব তাল পড়ে দীপু আর তপুর ওপর।

মাঝরাতে দুজনে কালো চা এনে আসরে রাখছিল। লোকগুলোর তন্ময়তা দেখে মনে হল খেলাটা খুব জোর জমেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ।

হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ। মনে হল বন্দুকের।

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো পাশে রাখা নিজেদের নোটগুলো নিয়ে পকেটে পুরল।

আবার দুম করে আওয়াজ। এবার যেন আরো কাছে।

একটা লোক হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলোর ওপর সজোরে আঘাত করল। লণ্ঠনের কাচগুলো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাতি নিভে সব অন্ধকার

দীপু আর তপু বুঝতে পারল, সেই জমাট অন্ধকারে একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে। সবাই যেন একটা দিক লক্ষ্য করে ছুটেছে।

দীপু অন্ধকারের মধ্যে তপুর হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল।

এই তপু, শীগগির ওদের পিছনে পিছনে চল। ওরা অন্য দিক দিয়ে বের হবার রাস্তা জানে।

দুজনে ছুটতে শুরু করল।

ততক্ষণে সিঁড়িতে একটা টর্চের আলো দেখা গেল। টর্চ নিয়ে কে যেন দ্রুত নেমে আসছে।

সেই টর্চের স্বল্প আলোতেই দেখা গেল একটা আলমারি। তার পাল্লা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আর একটুও বিলম্ব করল না। আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই আলমারির পাল্লাদুটো একেবারে এঁটে বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকগুলো কোন্ দিকে গেল কিছু বুঝতে পারল না।

এটুকু বুঝতে পারল, এতদিন যেটাকে আলমারি ভেবে এসেছে, আসলে সেটা আলমারি নয়, বাইরে যাবার রাস্তা।

বোধ হয় কোথাও কোন স্প্রিং আছে, যার সাহায্যে আলমারির পাল্লাদুটো খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

আস্তে আস্তে তপু পা ঘষতে লাগল।

মনে হল ভিতরে যেন ধাপ রয়েছে। নীচে নামবার সিঁড়ি।

দীপু।

উঁ।

মনে হচ্ছে নামবার সিঁড়ি আছে। লোকগুলো এখান থেকেই কোথাও চলে গেছে। আমরা নামবার চেষ্টা করি।

দুজনে হাত আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে লাগল।

যেন অনন্ত সোপান। শেষ নেই। বেশ কয়েকবার দুজনেই আছাড় খেতে খেতে সামলে নিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল, আবার নামতে শুরু করল।

যত নামতে লাগল, ততই নদীর কল্লোল স্পষ্ট হতে লাগল। নদী তো কাছেই, এই সিঁড়ি বোধ হয় নদীতেই শেষ হয়েছে।

ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তপু চেঁচিয়ে উঠল।

দীপু।

চেঁচাবার কারণ দীপুর বুঝতে অসুবিধা হল না।

জলে দুজনের গোড়ালি ডুবে গেছে।

তপু বলল, আর এগোলে আমরা তো নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তো নিরাপদ্ নয়। জোয়ারের জল এসে আমাদের ডুবিয়ে দেবে। যদি আমরা সিঁড়ি দিয়ে আরো ওপরে উঠে যাই, তাহলেও বাঁচব না। কতক্ষণ এই অন্ধকার গহ্বরে থাকব?

তপু বলল, তার চেয়ে জল ঠেলে এগোই চল। লোকগুলো তো এই পথেই গেছে।

দুজনে এগোতে আরম্ভ করল।

জল হাঁটুর ওপর। স্রোত দেখে বুঝতে পারল, এ জল নদীর।

বেশ কিছুটা যাবার পর সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে এল।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। দু'একটা তারা জ্বলছে।

নদীর প্রায় মাঝবরাবর একটা মোটর লঞ্চ দেখা গেল।

তপু সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

হয়তো লোকগুলো ওই লঞ্চেই পালিয়েছে।

দীপু বলল, খুব সম্ভব, কিন্তু আমরা কি করব?

চল, এপাশ দিয়ে যাই। নদীর জল ছেড়ে আমাদের ডাঙায় উঠতে হবে।

এদিকে জল কম, কিন্তু কাদা হাঁটু পর্যন্ত। খাড়া পাড়।

দুজনে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

সামনেই একটা জেটি। বোধ হয় ব্যবহার হয় না। একদিকটা ভেঙে গেছে।

তপু আর দীপু কাঠে পা দিয়ে দিয়ে সেই জেটির ওপর উঠল।

সর্বাঙ্গে কাদা, বুক পর্যন্ত ভেজা, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। আর চলবার শক্তি নেই। জেটির এককোণে একটা ছেঁড়া ত্রিপল পড়ে ছিল, কোনরকমে গিয়ে দুজনে তার ওপর শুয়ে পড়ল।

ব্যাস, আর চোখ খুলে রাখার ক্ষমতা নেই। দুজনে গাঢ় ঘুমে অচেতন।

কিছু লোকের কলরবে ঘুম ভেঙে গেল।

রোদ উঠেছে। নদীতে বোধ হয় জোয়ার। জলের শব্দ খুব জোর।

দুজনে উঠে বসল।

দুজনে এগোতে আরম্ভ করল। [পৃষ্ঠা ৪৫৮

জেটির ওপর কয়েকজন ভদ্রলোক পায়চারি করছে। নানাজাতের লোক। ভারতীয় আছে, বর্মীও আছে। দু'একজনের সঙ্গে ছেলেপুলেরাও রয়েছে।

ছেলেরা অবাক্‌চোখ মেলে তপু আর দীপুর দিকে চেয়ে রয়েছে।

অবশ্য তাদের দোষ নেই। একজন আর একজনের দিকে চেয়েই বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারল। সারা মুখে কাদা, তখনও জামা প্যান্ট কিছু ভিজে। কিম্ভূতকিমাকার দুটি মূর্তি।

তপু বলল, এবার? এবার কি করবি?

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। অন্ধকার দেখছি চোখে।

আমারও তো সেই অবস্থা।

দুজনে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দীপু বলল, আয়, আগে মুখ হাতের কাদা ধুয়ে ফেলি। এমন অবস্থায় দেখলেই সবাই পাগল ভাববে।

তপু বলল, কোথায় ধুবি?

চল, ওই চায়ের দোকানে একটু জল চেয়ে দেখি। নদীতে নামলে আবার তো কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রাস্তার পাশেই ছোট একটা চায়ের দোকান।

বিরাট এক কেটলি চাপানো। পাশে একটা বড় উনানে রুটি সেঁকা হচ্ছে। সে রুটির সাইজও বিরাট।

টিনের চেয়ার টেবিল। যারা চা রুটি খাচ্ছে তাদের দেখে শ্রমিক শ্রেণীরই মনে হল।

দুজনে দোকানের এক ছোকরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু মুখ ধোবার জল দেবে?

ছোকরা একবার মুখটা তুলে ওদের দিকে দেখল, তারপর বলল।

বাইরে বালতি আর মগ আছে।

দোকানে ঢোকবার মুখে জলভরা বালতি ছিল। পাশে মগ।

মুখ হাত ধোয়া শেষ করে দুজনে আবার দাঁড়াল দোকানের সামনে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে। যদি কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটু চা কিংবা রুটির টুকরো খেতে দেয়। কারুর প্লেটের ভুক্তাবশেষ খেতেও আজ তাদের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু কেউ তাদের দিকে একবার ফিরেও দেখল না।

দু'একজন করে শ্রমিকরা উঠে যেতে লাগল।

এই শোন।

খুব মোলায়েম কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে উঠল।

এতক্ষণ শ্রমিকদের ভিড়ের জন্য চোখে পড়ে নি। এবার দেখা গেল।

চোখে কালো চশমা, পরনে দামী ছোট কোট আর লুঙ্গি, একজন বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, সেই কথা বলল।

তবু নিশ্চিত হবার জন্য তপু বলল।

আমাদের?

লোকটা এবার কথা নয়, ইশারায় ওদের কাছে ডাকল।

চল, লোকটা কিছু খেতে দিতেও পারে।

দুজনেই আস্তে আস্তে এগিয়ে লোকটার টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোমরা দুজনে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। কি ব্যাপার বল তো?

তপু একটু ইতস্ততঃ করল। দীপু বলল।

আমরা এদেশে নতুন। জাহাজ থেকে নেমে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

তাই বুঝি? তাহলে তো তোমরা ভীষণ মুশকিলে পড়েছ।

হ্যাঁ, এইবার তপু বলল, কাল থেকে আমাদের পেটে কিছু পড়ে নি।

আহা হা, তাই তোমাদের মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে। বস, বস, সামনের চেয়ারে বসে পড়।

কথা শেষ হবার আগেই দুটো চেয়ার টেনে দুজনে বসে পড়ল।

লোকটা দোকানের ছোকরাকে হাত নেড়ে ডেকে বলল।

এই এদের পেট ভরে খাইয়ে দাও তো।

যতক্ষণ দীপু আর তপু খেল, লোকটা বসে বসে কাগজ পড়তে লাগল।

খাওয়া শেষ হতে কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

চল, তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।

দীপুর সঙ্গে তপুর দৃষ্টিবিনিময় হল।

অর্থাৎ, আবার কি ব্যবস্থা! নতুন কোন বিপদের মধ্যে পড়ব না তো!

দীপু ফিসফিস করে বলল।

পৃথিবীর সব লোক অসৎ, তা কি হতে পারে। কিছু ভাল লোকও তো আছে।

তপুর সন্দেহ গেল না।

জিজ্ঞাসা করল, আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন?

চীনেটা পরিষ্কার বাংলা বলত, এ লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। ঘোরতর বিপদের মধ্যে না পড়লে এ ধরনের বাংলা শুনলে দীপু আর তপু দুজনেই হাসাহাসি করত।

লোকটা বলল, জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা। তোমাদের কথা তাদের জানিয়ে দেব, যাতে অন্য একটা জাহাজে তোমাদের ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়।

আবার ভারতবর্ষ, তার মানে অভিভাবকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

যে অপরাধ দুজনে করেছে তাতে এবার হয়তো পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে।

তবু বিদেশে এই অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে, এভাবে বিপদের পর বিপদের ঝুঁকি নেবার চেয়ে, দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।

রাস্তার ওপর কালো একটা মোটর।

লোকটা মোটরের দরজা খুলে বলল।

একটু সাবধানে উঠ, ভিতরে আমার অনেক জিনিস রয়েছে।

সত্যিই তাই। সীটের ওপরে, নীচে ছোট বড় অনেক প্যাকেট।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে লোকটা দুজনের নাকের ওপর রুমাল চেপে ধরল দু'হাতে। তীব্র ওষুধের গন্ধ। মাথা ঘুরে গেল। আস্তে আস্তে চোখের ওপর কালো যবনিকা নেমে এল।

[ক্রমশঃ]

ভেসে যাওয়ার পথ

ওপরের ছবিতে পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর একটি ফুটকি দেওয়া ও একটি লাইন টানা পথ দেখান হয়েছে। ফুটকি পথে ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ আবিষ্কারক ম্যাগেলান জলপথে পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন। লাইন টানা জলপথে সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত ট্রাইটন নামে ডুবোজাহাজ জলের উপর একবারও না উঠে পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। ম্যাগেলানের লেগেছিল ৩ বছর। ট্রাইটনের লেগেছে ৬১ দিন। এই দীর্ঘ পথের দূরত্ব ৩১,০০০ মাইল।

চাকার গাড়ি

ঐতিহাসিকদের মতে ৫,৫০০ বছর আগে পারস্য উপসাগরের ধারে এক চাষী একটা লম্বা কাঠের দু'দিকে চাক্তি লাগিয়ে প্রথমে চাকাওলা গাড়ি আবিষ্কার করে। আজকের দিনে একথার গুরুত্ব বেশী না হলেও তখনকার দিনে বিরাট বুদ্ধিমান্ বলে লোকে তাকে তারিফ করেছিল নিশ্চয়ই।
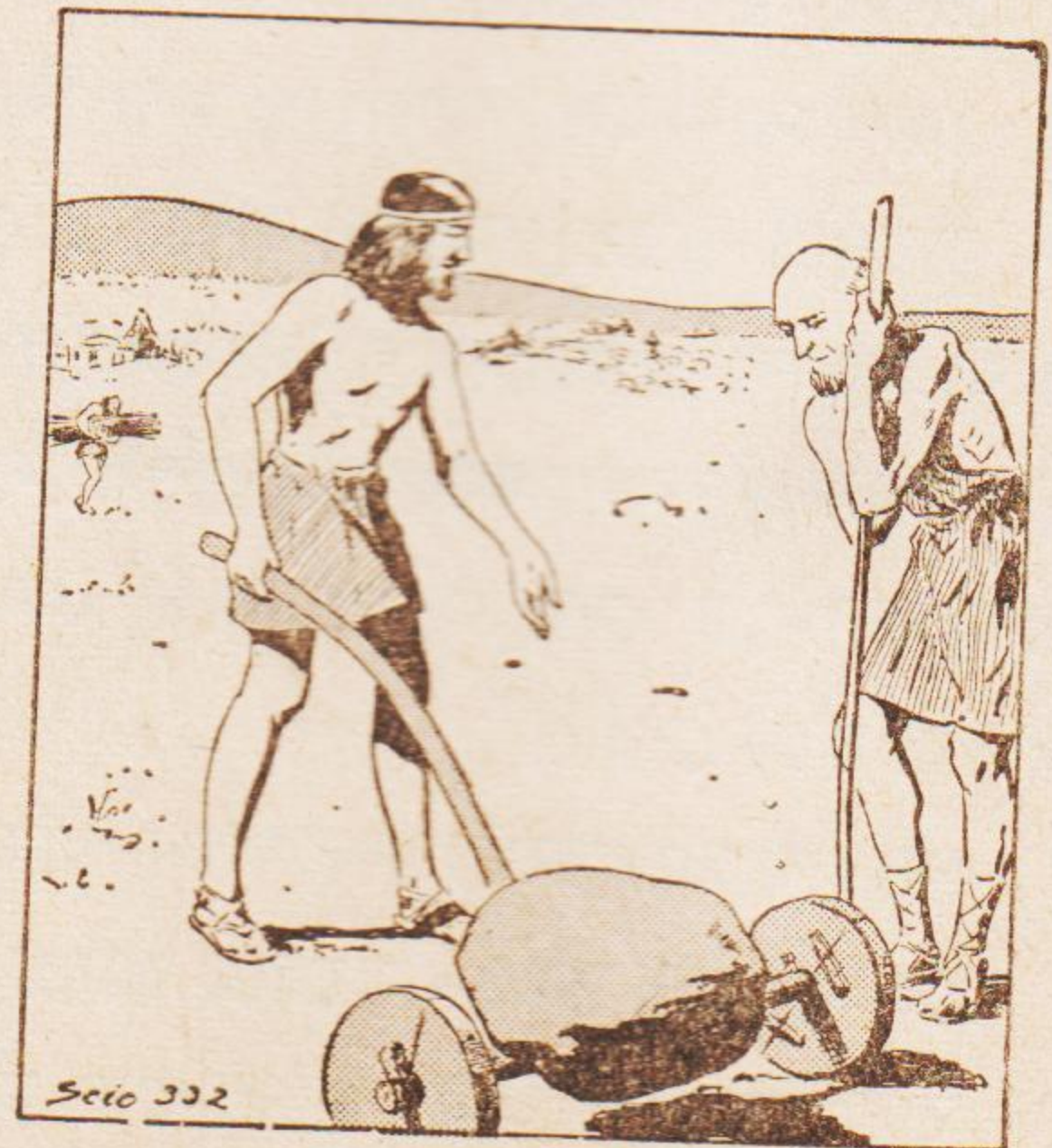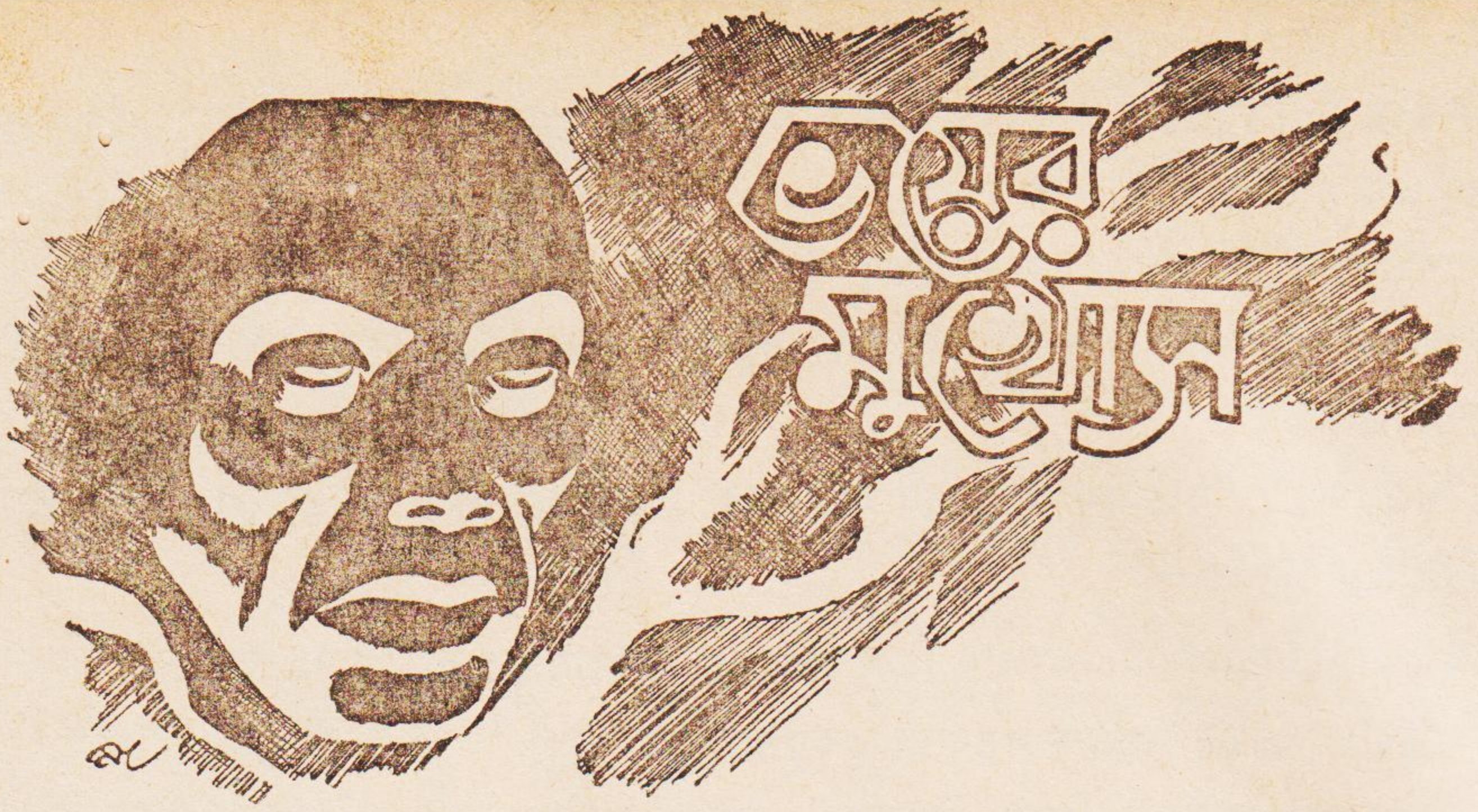
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রথমে তপু চোখ মেলল। তারপর দীপু।

দুজনে বড় একটা খাটে শুয়ে ছিল।

এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই চায়ের দোকানে দেখা লোকটা নজরে পড়ল। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে ছিল।

এদের চোখ মেলতে দেখে সে খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

কি, শরীর কেমন লাগছে ?

তপু চেঁচিয়ে উঠল।

শরীরের খোঁজ নিচ্ছ ? তুমিই তো নাকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে দিয়েছিলে।

লোকটা হাসল। আকর্ণবিস্তৃত হাসি, কিন্তু নিঃশব্দ।

হাসি থামতে বলল, এমনি কি আর তোমরা আসতে। চেঁচামেচি শুরু করে লোক জড় করে ফেলতে। আমি পড়তাম মুশকিলে।

দরজায় খট্ করে একটা শব্দ হল।

দীপু আর তপুকে সচকিত করে সেই চীনেটা ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে বর্মী লোকটা বলল।

এই যে আ লিম খুড়ো এসে গেছে। তোমাদের সঙ্গে খুড়োর তো চেনা আছেই।

আ লিম এগিয়ে এসে দীপু আর তপুর পিঠ চাপড়াল।

বাহাদুর ছেলে। কাল রাতে পুলিসের লোককে খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ। তোমরা ধরা পড়লেই মুশকিলে পড়তাম। তোমাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত।

দীপু হঠাৎ বলল।

পুলিসের লোকই বা তোমার আড্ডায় হামলা করল কেন ?

খাটের এক প্রান্তে বসে পড়ে আ লিম মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

আর বল কেন। ওদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। যত শান্তিপ্রিয় লোকদের পিছনে লাগাই ওদের স্বভাব।

দীপু আর তপু কিছু বলল না। ওটা জুয়ার আড্ডা সেটা যে ওদের অজানা নয় এ কথা জানতে পারলে আ লিম হয়তো খেপেই যাবে।

আ লিম বলল।

যাক, তোমরা খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। বিকালে তোমাদের এক-জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

কথা শেষ করে আ লিম আর দাঁড়াল না। খাট থেকে নেমে বেরিয়ে গেল।

তখন দীপু বর্মীটাকে বলল।

তুমি যে বলেছিলে আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে।

বর্মী মুখ মুচকে হাসল।

কি হবে দেশে ফিরে। এখানে থেকে যাও। এ বড় মজার দেশ। যাক, আগে তোমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।

খাওয়াদাওয়া ভাল। থাকার ব্যবস্থাও উত্তম।

তবে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল দুজন বর্মী ছোকরা পাহারা দিচ্ছে। দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ।

আ লিম এল বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এই নাও তোমাদের জন্য নতুন পোশাক এনেছি, পরে নাও। এবার আমরা বেড়াতে বের হব।

আ লিম খাটের ওপর দুটো নতুন সার্ট আর নতুন প্যান্ট ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপু বলল, এই জামা প্যান্টটার আর পদার্থ নেই। নতুন পোশাক পরি, কি বল ?

তপু ম্লান হাসল, খুড়ো যখন বলেছে, তখন পরতেই হবে। এখানে আমাদের মতামতের কোন দাম নেই।

একটু পরে আবার আ লিম ঢুকল।

পরা হয়ে গেছে। বেশ বেশ, চল, বের হই এবার।

তিনজনে বের হল।

কালো একটা মোটর সামনে। সমস্ত কাঁচগুলো কালো রং দেওয়া। বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখার উপায় নেই।

এরা উঠতেই মোটর ছেড়ে দিল।

বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না, ভিতর থেকে কাঁচে চোখ রাখলে বাইরের সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

দীপু আর তপু কাঁচে চোখ রেখে দেখতে লাগল।

একটু গিয়েই চোখে পড়ল সোনালী রং করা গম্বুজাকৃতি একটা মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে অনেকে উঠছে।

এটা কিসের মন্দির ?

তপু জিজ্ঞাসা করল।

আ লিম দেখল না। গাড়ির মধ্যে চোখ রেখেই বলল, ওটা হচ্ছে সুলে প্যাগোডা। মানে, ছোট ফয়া। বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে এখানে।

প্যাগোডা পার হয়ে মোটর ছুটল। অনেকটা যাবার পর দুপাশের দৃশ্য দেখে তপু আর দীপুর মনে হল, মোটর শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামে ঢুকছে। বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বিরাট সাইজের কাঠের গুঁড়ি কোথাও স্তূপাকার করা।

একসময়ে মোটর থামল।

চারদিকে ফাঁকা মাঠ। ছোট ছোট ঝোপ। একটা বড় নালা। তার ওপর বাঁশের সাঁকো।

আ লিম বলল।

আমার একটা উপকার করতে পারবে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল।

এই মাঠটা পার হয়ে একটা কাঠের একতলা বাড়ি দেখতে পাবে। তার মালিকের হাতে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসতে হবে। বলবে, এ মাসের খোরাক। আমিই যেতাম কিন্তু সকাল থেকে কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে, চলতে কষ্ট হচ্ছে।

দীপু বলল, কিন্তু আমাদের ভাষা ও লোকটা বুঝবে কেন ?

বা, ঠিক কথা বলেছ, আ লিম খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কথাটা আমার খেয়ালই হয় নি। কোন কথা বলতে হবে না, তোমরা দুজনে বরং একসঙ্গে মাথায় একটা হাত রেখ। তাহলেই আমার বন্ধু বুঝতে পারবে।

দীপু আর তপু সাঁকো পার হয়ে এগিয়ে চলল।

অনেকটা যাবার পর পিছন ফিরে দেখল। আ লিম মোটরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

এটার মধ্যে কি আছে বল তো তপু?

বোঝাই যাচ্ছে কোন নিষিদ্ধ জিনিস। গাঁজা, আফিং কিংবা কোকেন। বুড়োর কোমরে ব্যথার কথা সব বাজে, বিপদ্‌টা আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিল। ধরা পড়ি তো আমরা পড়ব।

দীপু একবার এদিক ওদিক দেখে বলল।

চারদিক ফাঁকা। পালাবার চেষ্টা করলে হয়।

উঁহু, নিশ্চয় চারদিকে বুড়োর চর আছে। পালানো সম্ভব হবে না। ধরা পড়লে নির্যাতন শুরু হবে। একেবারে খতম করে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

দুজনে দ্রুত পা ফেলে চলতে লাগল।

একটা খালের ধারে একতলা বাংলো। চারদিকে বাগান। ধারেকাছে যখন আর কোন বাড়ি নেই, তখন এটাই হবে।

লোহার ফটক। বন্ধ।

কাছে গিয়েই দীপু আর তপুর খেয়াল হল, কি বলে ডাকবে? লোকটার নাম তো জানা নেই। এ বাড়িতে অনেকগুলো লোক যদি থাকে, তাহলে প্যাকেটটা কার হাতে দেবে?

দুজনে আলোচনা করতে করতে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

হাত দিয়ে গেটটা তো নাড়ানো যাক। দেখি কে আসে।

গেটটা হাত দিয়ে ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ।

চমকে দুজনে পিছিয়ে এল।

গেটের ওপারে নেকড়ে বাঘের সাইজের এক কুকুর। লকলক করছে জিভ। দুটো থাবা গেটের ওপর দিয়ে বিকট গর্জন করে চলেছে।

কি ভাগ্যিস, গেটটা বন্ধ ছিল, নাহলে বাঘের মতন ওই কুকুরটা এতক্ষণে দুজনের টুটি কামড়ে ধরত।

পালিয়ে যাবে কিনা ভাববার মুখেই বারান্দায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। মাথাজোড়া চকচকে টাক, ঝোলা গোঁফ, চোখদুটো এত ছোট যে আছে কিনা বোঝাই দুষ্কর।

কে? কি চাই?

উত্তরে দীপু প্যাকেটটা তুলে ধরল। তপু একটা হাত রাখল নিজের মাথায়।

মনে হল প্যাকেটটা দেখে লোকটা যেন একটু প্রসন্ন হল।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে কি বলল। অমন বাঘের মতন তেজী কুকুর পলকে শান্ত হয়ে গেল।

গেটটা খুলতেই দীপু আর তপু কিন্তু বেশ কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু না, কুকুরটা এল না। ল্যাজ গুটিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

লোকটা এগিয়ে এসে এদিক ওদিক দেখল তারপর কোন কথাবার্তা নয়, চিলের মতন ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল।

দীপু আর তপু তো অবাক্।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফেরার পথ ধরল।

পথে তপু বলল, আমাদের দিয়ে কেন এসব করাচ্ছে বুঝতে পারছিস?

পারছি বইকি। পুলিস যদি ধরে আমাদের ধরবে। তাছাড়া আমরা এদেশে নতুন, পথঘাট চিনি না, ওদের আস্তানাও জানি না। কাজেই পুলিসের কাছে কিছুই বলতে পারব না।

আমাদের তাহলে সাবধান হওয়া উচিত।

সাবধান আর কি করে হব? এদের কাজ করব না বললে হয়তো মেরেই ফেলবে।

তা সত্যি।

সাঁকো পার হয়ে দুজনে রাস্তায় এসেই অবাক্।

রাস্তা ফাঁকা। মোটর কোথাও নেই। আ লিমও নয়।

চারদিকে একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। কাছাকাছি বসতি নেই বলে, আলোও দেখা যাচ্ছে না এধারে ওধারে জোনাকির মেলা।

তাইত মোটর কোথায় গেল?

তপুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল সে ভয় পেয়েছে।

আমাদের ফেলে চলে গেল নাকি?

কিন্তু তাতে চীনের লাভ?

কি জান, হয়তো পুলিস ঘোরাফেরা করছিল, দেখে মোটর নিয়ে সরে পড়েছে।

উপায়?

চল, যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে হাঁটতে আরম্ভ করি।

দুজনে তাই করল। বুঝতে পারল এতটা পথ হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক করল, রাস্তায় যদি কোন বাড়ি পায়, সেখানে আশ্রয় চাইবে।

তাতেও অসুবিধা কম নয়। এদেশের ভাষা জানে না। নিজেদের বিপদের কথা বোঝাবে কি করে?

কিছুটা গিয়েই দুজনে চমকে উঠল।

মোটরের হর্ন, অথচ ধারেকাছে কোথাও মোটর নেই।

দুজনে দাঁড়াল।

একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে একট মোটর বেরিয়ে এল।

মোটর থেকে আ লিম নামল।

আরে, দুজনে হনহন করে চলেছ কোথায়?

কি করব, রাস্তায় মোটর দেখতে পেলাম না।

আ লিম হাসল। আধোঅন্ধকারে তার সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো চকচক করে উঠল।

রাস্তার মাঝখানে মোটর রাখতে আছে। ফাঁকা রাস্তা, কখন আর কোন গাড়ি এসে ধাক্কা লাগিয়ে দেবে, তাই একপাশে মোটর সরিয়ে রেখেছিলাম। নাও নাও, উঠে এস।

দীপু আর তপু মোটরে উঠে বসল।

মোটর চলতে শুরু হতে আ লিম জিজ্ঞাসা করল।

চিলের মতন ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়েই··· [পৃষ্ঠা ৫৪০

জিনিসটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ তো?

তপু বলল, তা দিয়েছি, কিন্তু কি সাংঘাতিক কুকুর। কামড়ালে আর বাঁচতে হত না আমাদের।

আ লিম আবার হাসল।

বুঝলে না, ওরকম ফাঁকা জায়গায় থাকে, বিপদ্ ঘটতে কতক্ষণ। সেইজন্যই বাঘা কুকুর রেখেছে।

দীপু প্রশ্ন করল।

আচ্ছা, ও জিনিসটা কি? যেটা আমরা দিয়ে এলাম।

অন্ধকারে আ লিমের মুখ দেখা গেল না। মনে হল দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন অস্ফুট একটা শব্দ করল।

তারপর ঢোঁক গিলে বলল।

ওষুধ, ওষুধ। বেচারী হাঁপানিতে ভুগছে। বাড়ি থেকেও বের হতে পারে না, তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিলাম।

সারাটা রাস্তা আর কোন কথা হল না।

পুরোনো আস্তানায় পৌঁছে বর্মী লোকটির হাতে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আ লিম চলে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে কথা হল।

দীপুই শুরু করল।

তুমি আমাদের দেশে ফেরার কি করলে ?

একটা কাঠি দিয়ে বর্মী দাঁত খুঁটছিল। খুঁটতে খুঁটতেই বলল।

দেশে ফিরে আর কি করবে তোমরা ? এখানেই থেকে যাও, তোমাদের ভাল হবে।

দীপু রেগে উঠল।

ছাই ভাল হবে। রোজ রোজ আমাদের দিয়ে গাঁজা কোকেন চালান দেবার চেষ্টা। পুলিসের কাছে ধরা পড়লে কি হাল হবে আমাদের ?

দীপুর কথার সঙ্গে সঙ্গে বর্মীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে বজ্রকঠিনস্বরে বলল।

বেশী চালাক হবার চেষ্টা কর না, বিপদে পড়বে। ঠিক যা বলব, সেইটুকু করে যাবে। কোন কথা বলবে না। তোমাদের মতন অবাধ্য গোটা তিনেক ছেলে আমাদের হাতে এসেছিল। মেজাজ দেখিয়েছিল, তিনটেই চিতাবাঘের খোরাক হয়ে গেছে। সাবধান।

বর্মীটা উঠে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের চোখে ঘুম এল না। বিছানায় চুপচাপ বসে রইল। কথা বলতেও সাহস হল না। এরা বাংলা বোঝে। বলা যায় না, চারদিকে হয়তো কান পেতে রেখেছে।

পরের দিন উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

যখন উঠল, তখন রোদের তেজ খুব কড়া।

বিছানায় বসে দেখল, টেবিলের ওপর দু কাপ চা আর দু বাটি শিমের বীচিসিদ্ধ পড়ে রয়েছে।

মুখ হাত ধুয়ে দুজনে খেয়ে নিল।

আ লিম এল বিকালের দিকে।

নাও নাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। বিকালে একটু না বের হলে শরীর থাকবে কি করে।

ওদের স্বাস্থ্যের জন্য এত উদ্বেগের আসল কারণ বুঝতে দুজনেরই কোন অসুবিধা হল না।

কিন্তু এও বুঝল, এটা আদেশ।

এ আদেশ মানতেই হবে।

সেই মোটর, তবে আজ মোটর নদীর ধার দিয়ে চলল।

কয়েকটা জাহাজও দীপু তপুর চোখে পড়ল আর সেই সঙ্গে তাদের দুটো চোখ জলে ভরে উঠল।

কোনরকমে যদি একটা জাহাজে ওরা উঠতে পারত তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে পায়ে ধরে যেমন করে হোক দেশে ফেরার ব্যবস্থা করত।

মোটর থামল। যেখানে থামল সেখানে কোন জেটি নেই। কাদাভর্তি জমি। কিছু সাম্পান মাঝখানে ঘোরাফেরা করছে।

আ লিম নেমে এদিক ওদিক দেখল তারপর চাপাগলায় ড্রাইভারকে কি বলল। ড্রাইভার বিচিত্র ঢংয়ে হর্ন বাজাতে শুরু করল। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ।

বারকয়েক বাজাতেই মাঝদরিয়া থেকে একজন মাঝি সাম্পানের ওপর দাঁড়িয়ে, দুটো হাত মুখের পাশে দিয়ে চীৎকার করল, তারপরই জল কেটে কেটে সাম্পান ডাঙ্গার দিকে নিয়ে এল।

বাঁশের একটা খুঁটিতে সাম্পান বেঁধে মাঝি কাদা ভেঙে ওপরে উঠে আ লিমকে সেলাম করল।

আ লিম দীপু আর তপুকে দেখিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। মাঝি ঘাড় নাড়ল।

তারপর আ লিম দীপু আর তপুর দিকে ফিরে বলল।

তোমরা সাম্পানে ওপারে চলে যাও। ঘাটে একজন লোক থাকবে। তোমরা যেতেই জিজ্ঞাসা করবে, ওপারে চালের দর কি রকম? তোমরা বলবে, এপারের মতনই। ব্যস, তারপর লোকটা তোমাদের পথ দেখিয়ে যে বাড়িতে নিয়ে যাবে, সে বাড়ির মালিককে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?

ঘাড় নড়ে, আলিমের ছ থেকে মাঝারি সাইজের একটা প্যাকেট নিয়ে দীপু আর তপু মাঝির সঙ্গে নেমে গেল।

খুব সন্তর্পণে কাদার ওপর দিয়ে দীপু আর তপু সাম্পানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছেড়ে দিল।

দীপু চুপিচুপি তপুকে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের ফেরার কি হবে?

তপু বলল, ভগবান্ জানেন। বোধ হয় ওপারের লোকটাই তার নির্দেশ দেবে।

ওপারে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল।

ভাঙা একটা ঘাট। ইট-বের-করা। কাছেপিঠে কেউ নেই।

দুজনে সমস্যায় পড়ল। তাহলে কে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে।

মাঝি নামিয়ে দিয়েই সাম্পান নিয়ে সরে গেল।

দীপুর হাতে প্যাকেটটা ছিল। সার্টের মধ্যে।

দুজনে ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল। কাউকে দেখতে পেল না।

অনেক দূরে কয়েকটা বস্তি। দু একটা কারখানাও দেখা যাচ্ছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ওগুলো বোধ হয় চালের কল। বইতে দীপু আর তপু পড়েছিল বর্মাদেশ চালের জন্য বিখ্যাত।

কিন্তু লোক না থাকলে কি করবে এই প্যাকেট নিয়ে। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ফিরেই বা যাবে কি করে। সাম্পান অনেক দূরে চলে গেছে।

মুশকিল হল তো!

তপু বলল।

ঘাটের কাছে বিরাট ঝাঁকড়া একটা বটগাছ। বড় বড় ঝুরি মাটিতে নেমেছে। নীচেটা অন্ধকার।

দুজনে এসে বটগাছতলায় দাঁড়াল।

তারপর একটু উঁকি দিয়েই তপু দীপুকে বলল।

ওই দেখ।

দীপু সেদিকে দেখেই ভ্রূ কোঁচকাল।

[ক্রমশঃ]

সাগরের নীচে কয়লার খনি

নোভাস্কোটিয়া প্রদেশে কয়লার খনি আছে। এই সব খনি আটলান্টিক সাগরের নীচে দেশের সীমানা থেকে তিন চার মাইল সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। খনির ছাত ও সমুদ্রের তলভূমির মাঝখানে প্রায় ৪০০ ফিট পুরু পাথর থাকায় সমুদ্রের জল খনিতে ঢুকতে পারে না।
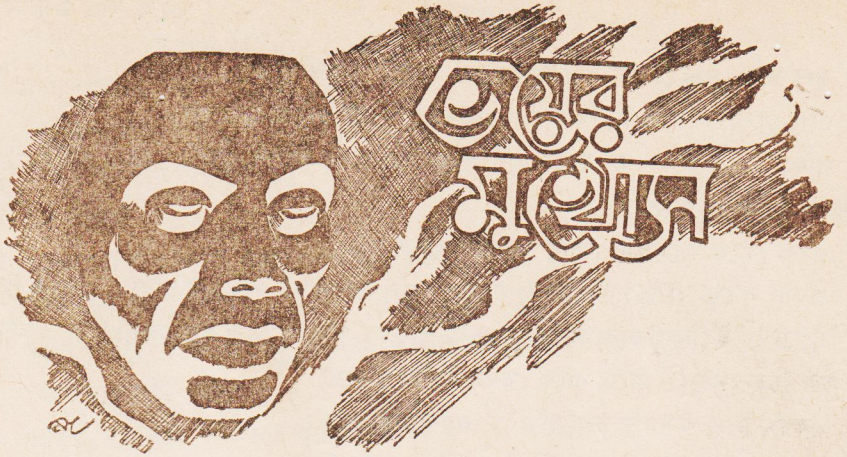
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বটগাছের নীচে এ:জন বুড়ো মুচী। খুব বুড়ো। মুখের গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। চোখে চশমা। চশমার ডাঁটি নেই, সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে জড়ানো। একমনে একটা চটিতে পেরেক ঠুকছে।

দীপু বলল, এ ছাড়া তো আর ধারেকাছে লোক দেখছি না।

তপু বলল, চল, ওর সামনে গিয়েই দাঁড়ানো যাক।

দুজনে মুচীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুচী মুখ তুলল না। ওদের ছায়ার দিকে চোখ রেখে বলল।

চাউলকা ও তরফমে কেয়া দাম ?

দীপু আর তপু দুজনেই সামান্য হিন্দী জানত। তাদের বাড়ির গয়লা হিন্দুস্থানী। তাছাড়া তাদের বাড়ির আশেপাশে কলকারখানা। সেখানে অনেক হিন্দুস্থানী শ্রমিক ছিল। তাদের কল্যাণে ওরা দুজনেই হিন্দী শিখেছিল।

দীপু বলল, এ তরফকা মাফিক একই হ্যায়।

এবার মুচী মুখ তুলে দুজনকে দেখল, তারপর জুতো সারাবার সরঞ্জাম বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দু এক মিনিট, তারপরই মুচী চলতে আরম্ভ করল।

দীপু আর তপু পিছন পিছন চলতে লাগল।

একটু পরেই মুচী এত দ্রুত চলতে লাগল যে দীপু আর তপুর পক্ষে তাল রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

তপু বলল, চলা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না মুচীটা এত বুড়ো।

দীপু চাপাগলায় বলল, কিছু বলা যায় না। সবই হয়তো ছদ্মবেশ।

পাকা [illegible] য় কাঁচা পথ শুরু হল। দু পাশে জলা। ছোট ছোট কুঁড়ে। শুয়োর আর মুরগীর পাল চরছে।

এঁকে বেঁকে অনেকটা চলার পর মুচী থামল।

একটা প'ড়ো বাড়ি। ইটের ফাটলের পাশে পাশে বট অশথের চারা। পিছন দিকটা ধসে গিয়েছে। ইঁটের টুকরো সাজানো ছোট রাস্তা। পাঁচিল বোধ হয় একটা ছিল একসময়ে, এখন তার চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে কেবল ইঁটের চাঙড়।

একদম সিধা আন্দার চলা যাও। একদম আন্দার।

মুচী হাত প্রসারিত করে বাড়ির মধ্যেটা দেখিয়ে দিল।

দীপু আর তপু আশা করেছিল, মুচী আর দাঁড়াবে না। চলে যাবে।

হলও তাই। মুচী হনহন করে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে কি না এটা একবার ফিরেও দেখল না।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ঝাঁক পায়রা ঝটপট করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ওরা একটু অপেক্ষা করে চৌকাঠ পার হল।

কেউ কোথাও নেই। ঘরদোরের ধুলোভরা অবস্থা দেখে মনে হয়, এ বাড়িতে অনেকদিন বোধ হয় কোন লোকের বাস ছিল না।

এমন এক জায়গায় আ লিম প্যাকেট দেবার জন্য কেন পাঠাল?

আরো ভিতরে ঢুকল।

একটা হলঘর। বড় একটা খাবার টেবিল। দু পাশে গোটা ছয়েক চেয়ার। টেবিল খালি। কোন খাবার জিনিস নেই।

হলঘর পেরিয়ে ওরা পাশের একটা ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘর। একপাশে একটা ক্যানভাসের খাট। কোণের দিকে একটা চেয়ার। তার সামনে টেবিল।

দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেল।

একটা লোক চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছে। একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের ওপর। বোধ হয় কিছু পড়ছে।

একেবারে তন্ময় হয়ে, কারণ দীপু আর তপুর পায়ের শব্দেও লোকটি ফিরল না।

দীপু বলল, কি করা যায়?

তপু বলল, চেঁচিয়ে ডাকব।

কি বলে ডাকবি?

তার চেয়ে এক কাজ করি।

কি কাজ?

দরজায় ঠকঠক করি, তাহলেই ফিরে দেখবে।

তাই ঠিক হল।

প্রথমে তপু, তারপর দীপু, শেষকালে একসঙ্গে দুজনে ঠকঠক করতে লাগল দরজায়।

লোকটার সাড় নেই।

ভাইত, লোকটা বসে বসে ঘুমাচ্ছে নাকি?

কিন্তু কি ঘুম রে বাবা, এত আওয়াজেও ঘুম ভাঙছে না!

আমাদের যে দেরি হয়ে যাবে। এতটা পথ হেঁটে ফিরতে হবে, তারপর নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। কি করা যায়?

চল, আমরা এগিয়ে টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে আসি।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

অদ্ভুত ঘর। একটা জানলা পর্যন্ত নেই। টেবিলের ওপর ল্যাম্প জ্বলছে। খুব জোর পাওয়ার। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি, দুটো সরু মাদুর টাঙানো, মাদুরের ওপর প্রাকৃতিক দৃশ্য।

দুজনে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটার ঝুঁকে পড়ে বসাটা যেন অস্বাভাবিক।

পরনে সার্ট আর প্যান্ট। পা খালি। লোকটার মুখটা দেখা গেল না।

এবারে সাহস করে দীপু লোকটাকে একটা ঠেলা দিল। মৃদু ঠেলা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কাত হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

চেয়ারটা ছিটকে পড়ল একপাশে।

দীপু আর তপু চীৎকার করে একদিকে সরে গেল।

লোকটা মারা গেছে।

দীপু কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বলল।

কিন্তু মরেও এভাবে চেয়ারে বসে ছিল কি করে?

বোধ হয় চেয়ারের হাতলে কোনরকমে আটকে গিয়েছিল, ধাক্কা দিতে পড়ে গিয়েছে।

বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনের মনে সাহস হল।

তপু টেবিল ল্যাম্পটা নামিয়ে মেঝের ওপর নিয়ে এল।

লোকটা বোধহয় এদেশী। দুটো চোখ বিস্ফারিত। যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। অথচ কোথাও গুলির কিংবা ছোরার দাগ দেখতে পেল না।

তাহলে কি করে মরল লোকটা?

বিষে মৃত্যু হলে, দীপু আর তপু শুনেছিল যে, মৃত নীল হয়ে যায়। সে রকম তো কিছু হয় নি।

আর নয়, চল আমরা পালাই এখান থেকে।

তপু বাতিটা মেঝের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

চল।

দুজনে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগোতে লাগল।

দুটো পা ঠকঠক করে কাঁপছে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া তাদের এই প্রথম।

কোনরকমে মুক্ত আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে যেন বাঁচে।

যেতে যেতে তপু হোঁচট খেল। দেয়ালে টাঙানো মাদুরটা চেপে ধরে কোনরকমে টাল সামলাল।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড।

সমস্ত দেয়ালগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক যেন ভূমিকম্প।

কাছে দড়াম করে একটা শব্দ হল।

কিসের শব্দ তখন ওরা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল চৌকাঠের কাছে গিয়ে।

বাইরে যাবার ভারি কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ!

দীপু আর তপু প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। চীৎকার করল।

দরজা এক ইঞ্চি ফাঁক হল না। বাইরে থেকে কেউ এল না সাহায্যের জন্য।

দুজনে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

অন্য কোন দিক দিয়ে বাইরে যাবার পথ আছে কিনা তার খোঁজে এদিক ওদিক দেখল। পাশে একটা খুব ছোট ঘর রয়েছে। আপাতত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

দীপু টেবিল ল্যাম্পটা টেনে এদিকের ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। ছোট তার। বেশীদূর আনা গেল না।

অল্প আলোতে যেটুকু দেখা গেল তাতেই দীপু আর তপুর আতঙ্কে দুটো চোখ কপালে উঠল।

কাঁচের ছোট, বড় জার। তার মধ্যে নানা-রকমের সাপ। কেউ চুপচাপ নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে, কেউ ফণা প্রসারিত করে কাঁচের ওপর ছোবল দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নীল বিষ গড়িয়ে পড়ছে।

দীপুর কোমর জড়িয়ে দুটো পা গুটিয়ে নিল। [পৃষ্ঠা ৬১০

এ দৃশ্য দেখে দীপু এত ভয় পেয়ে গেল যে তার হাত কেঁপে টেবিল ল্যাম্পটা আছড়ে পড়ল। মাটিতে পড়বার আগে সেটা কাছের একটা কাঁচের জারের ওপর পড়ল।

ছোট্ট জার, তার ভিতরের সাপটাও ছোট। হলদে রং, তার ওপর কালো কালো ফোঁটা।

কিন্তু জার থেকে বাইরে এসে সেই ছোট্ট সাপটা ল্যাজে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুটো চোখ যেন জ্বলছে। লকলক করছে চেরা জিভ। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ।

প্রথমেই সাপটা টেবিল ল্যাম্পটার ওপর ছোবল দিল। ল্যাম্পটা মাটিতে পড়ে ছিল, ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে আরো গড়িয়ে গেল। তারটা সরে যাওয়াতে নিভে গেল।

ঘন অন্ধকার। কোথাও একটু আলো নেই। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিষাক্ত, ক্রুদ্ধ সেই সাপ গর্জন করে বেড়াচ্ছে। অন্য জারের কাঁচে তার ল্যাজের আছড়ানি শোনা যাচ্ছে। সামনে যা পাচ্ছে, তাতেই বোধ হয় ছোবল দিচ্ছে।

সেই ঘরে দীপু আর তপু পাগলের মতন এক দিক থেকে আর এক দিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনরকমে যদি কোন জারের ওপর গিয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। বিষাক্ত দংশনে দুজনেই শেষ হয়ে যাবে।

আর চুপচাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই মৃত্যু এড়াতে পারবে, এমন সম্ভাবনাও কম। সাপটা নিষ্ফল আক্রোশে সারাটা ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে।

কোনরকমে পাশের ঘরে চলে যাবে তাও সম্ভব নয়। দরজার গোড়াতেই জারের

ভাঙা কাঁচ আর টেবিল ল্যাম্প পড়ে রয়েছে। ছুটতে গিয়ে পায়ে কাঁচ ফুটলে, কিংবা তার জড়িয়ে গেলেও বিপদ্ কম নয়।

দীপু আর তপু ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ ছপাৎ করে একটা শব্দ।

দীপুর পাশের দেয়ালে সাপটা আছড়ে পড়ল।

মাগো! বলে দীপু লাফিয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠতেই দেয়ালে একটা হাতলে হাত ঠেকে গেল।

সেটা আঁকড়ে ধরে সে ঝুলতে লাগল।

পায়ের তলায় সাপটা গর্জন করে চলেছে।

তপু বেগতিক দেখে দীপুর কোমর জড়িয়ে দুটো পা গুটিয়ে নিল।

কিন্তু এভাবে ছোট একটা হাতল ধরে দীপু কতক্ষণ ঝুলে থাকবে। তার ওপর তপুর ভারও তার ওপর।

সাপটাও বোধ হয় ওদের সন্ধান পেয়েছে।

লাফিয়ে উঠে বার বার দেয়ালে ছোবল দিচ্ছে। প্রায় তপুর পায়ের কাছ বরাবর।

হাতদুটো পিছলে যাচ্ছে, তাই দীপু প্রাণপণ শক্তিতে হাতলটা আঁকড়ে ধরল।

হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ, তারপরই ঘড়ঘড় করে একটানা আওয়াজ। মনে হল দেয়ালটা আস্তে আস্তে যেন সরে যাচ্ছে।

কি হচ্ছে বোঝবার আগেই দীপু আর তপু গড়িয়ে পড়ল। দেয়ালের ওপাশে। আবার শব্দ করে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তপু প্রথমে উঠে বসল।

জায়গাটা খুব অন্ধকার নয়। কোথা থেকে ম্লান নীলচে আলো আসছে।

তপু আস্তে আস্তে ডাকল।

দীপু, দীপু।

একটু দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল।

উঁ।

শব্দ অনুসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে তপু এগিয়ে গেল। এত নীচু ছাদ, উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

দুটো বস্তার মাঝখানে দীপু পড়ে রয়েছে।

তপু কাছে গিয়ে গায়ে হাত ঠেকাতেই দীপু উঠে বসল।

বেশী লেগেছে?

দীপু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

না, আচমকা ছিটকে পড়ে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসল।

তপু বলল।

আমাদের সঙ্গে সাপটা তো এদিকে ঢুকে পড়ে নি?

দীপু একবার এদিক ওদিক চেয়ে বলল।

বোধ হয় না। দেয়াল ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাদুটো ছুঁড়তেই মনে হল সাপটা পায়ের ধাক্কায় যেন ছিটকে গেল। খুব ঠাণ্ডা বরফের মতন একটা স্পর্শ।

কিন্তু এ জায়গাটা কি?

কিছু বুঝতে পারছি না। একবার ঘুরে দেখা যাক।

সিঁড়ির মতন দুটো ধাপ। তারপর প্রশস্ত একটা হল।

একটা টেবিল, চারটে চেয়ার। পাশে একটা আলমারি।

দীপু আলমারি খুলে ফেলল।

পাঁউরুটি, বিস্কুট, টিনভর্তি মাছ, সিরাপ, আরও নানারকমের জিনিস সাজানো।

দীপু আর থাকতে পারল না।

বলল, জায়গাটা পরে দেখব, আগে আয় খেয়ে নিই। খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুজনে পেট পুরে খেয়ে নিল।

শরীর কিছুটা ঠিক হল। পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেটা কমল। দীপু আর তপু দুজনেরই।

চল, এদিক ওদিক দেখি এইবার।

আমার মনে হয়, এটা বোধ হয় ওদের লুকোবার জায়গা।

কাদের?

যারা এই সব গাঁজা আফিং কোকেনের ব্যবসা করে। সেইজন্য সারা বাড়িতে এত সব কলকবজা বসানো। পুলিস হানা দিলে এইখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকে।

লোকটাকে মারলে কে?

দীপু বলল, কি জানি! দলের কেউ হয়তো। এসব ব্যবসায় ভাগ নিয়ে রেষারেষি হয়। বইতে পড়িস নি?

তপু ঘাড় নাড়তে গিয়েই থেমে গেল। লাফিয়ে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, সাপ, সাপ।

ঠিক পাশে ই সোঁ সোঁ করে শব্দ। একটানা।

[ক্রমশঃ]
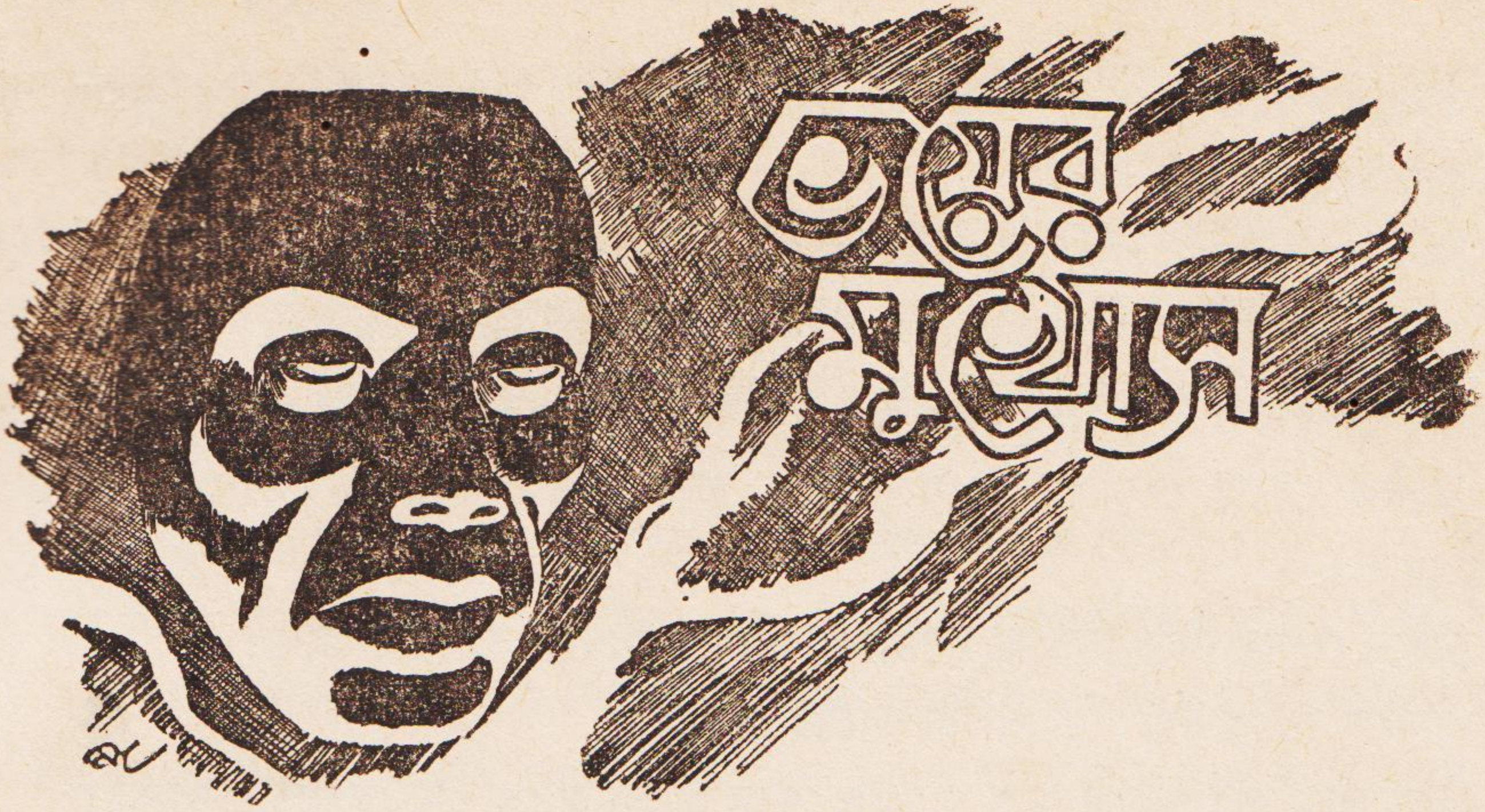
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দীপুও তপুর মতন টেবিলের ওপর উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল।

ছাদ ফুঁড়ে একটা টিনের নল ওপরে উঠেছে। বাইরে থেকে বাতাস সেই নলের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, তারই সোঁ সোঁ আওয়াজ।

ব্যাপারটা বুঝলি তপু, সাপ নয়।

তবে ?

বিজ্ঞানের বইতে পড়িস নি, অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মাটির তলায় এই সব কামরায় ওই নল দিয়ে বাতাস আসছে।

কিন্তু কোনরকমে যদি ওই বাতাস বন্ধ হয়ে যায় ?

তাহলেই আমরা খতম।

তপু টেবিল থেকে নেমে পড়ল। এখানে ছাদ খুব নীচু নয়, তারা কোনরকমে দাঁড়াতে পারে।

বলল, চল, এদিক ওদিক ঘুরে দেখি, বের হবার কোন রাস্তা আছে নাকি।

দুজনে হাঁটতে লাগল। বেশী হাঁটতেও হল না। সামনেই বাধা। পাথরের শক্ত দেয়াল। অর্থাৎ, পথ বন্ধ।

দীপু বলল, তার মানে ?

তপু পাথরের দেয়ালের নানা জায়গায় ঘুষি মেরে দেখল। সবটাই নিরেট, কোথাও ফাঁপা নয়।

মেঝের ওপর বসে পড়ে তপু বলল

তাহলে বুঝতে হবে বের হবার অন্য কোন পথ নেই। যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেখান দিয়েই বের হতে হয়।

কিন্তু তা কি করে হবে, সে দরজা তো বন্ধ।

বন্ধ হোক, এদিক থেকেও খোলবার কোন কলকবজা নিশ্চয় আছে। বোধ হয় বিপদের আশঙ্কা দেখলে হাতল টেনে এই সুড়ঙ্গঘরে সবাই চলে আসত, কিছুদিন কাটিয়ে আবার কোন-রকমে এদিক থেকে দেয়াল সরিয়ে ওদিকে চলে যেত। চল, ওই দেয়ালের কাছে গিয়ে একবার দেখি।

দুজনে যেখান দিয়ে ছিটকে পড়েছিল, আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে পাথর নয়, পালিশকরা কাঠের দেয়াল।

দীপু আর তপু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন হাতল বা বোতাম দেখতে পেল না।

ক্লান্ত হয়ে দুজনে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

দীপু বলল, আচ্ছা খাবার ঘর তো রয়েছে, কিন্তু লোকগুলো শোয় কোথায় ?

দুজনেই এদিক ওদিক দেখল।

প্রথমে আলো থেকে এসে আধঅন্ধকারে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখন এখানে কিছুকাল কাটাবার পর চারদিক বেশ পরিষ্কার।

দীপুই এদিক ওদিক দেখে বলল।

আমার মনে হচ্ছে এই নরম বস্তাগুলোর ওপরই বোধ হয় শুত। ভিতরে কি আছে কে জানে, বেশ নরম বলে মনে হচ্ছে।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়িয়ে বস্তাগুলো দেখল। কোণের দিকে গোটা তিনেক ছোট ছোট বস্তা। বোঝা গেল, এগুলো মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর বড় বস্তাগুলো শোবার গদি।

এত নরম, ভিতরে কি আছে কে জানে।

দীপু টিপে টিপে দেখল।

দাঁড়া দেখছি আমি।

তপু খাবার ঘরে চলে গেল। আলমারির মধ্যে সে ছুরি কাঁটা চামচ দেখেছিল। একটা কাঁটা হাতে করে ফিরে এল।

কাঁটাটা সজোরে বস্তার এক কোণে বসিয়ে দিতেই কালো গুড়ো হাতের ওপর ঝরে পড়ল।

সেগুলো নিয়ে আলোর নীচে গিয়ে দুজনে দাঁড়াল।

দেখেই বুঝতে পারল এগুলো কাঠের মিহি গুঁড়ো।

এইজন্যই এগুলোর ওপর ছিটকে পড়তে দুজনের বিশেষ লাগে নি।

এবার তপু বলল, এবার আমাদের কি কর্তব্য ?

কি আর কর্তব্য। শুয়ে পড়া উচিত। নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে। অবশ্য এখানে ঘড়ি যখন নেই আমাদের কাছে, তখন রাত দিন সবই সমান। তবে বিকালে আমরা প্যাকেট হাতে লোকটার ঘরে ঢুকেছিলাম, তারপর অনেক সময় কেটেছে। এখন যে রাত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

দুজনে দুটো বস্তার ওপর শুয়ে পড়ল। ছোট বস্তা মাথায় দিয়ে।

ভেবেছিল, শুলেই ঘুম আসবে, কিন্তু এল না। নানারকম চিন্তা মাথায় এল।

এমনও তো হতে পারে আর কোনদিনই দরজা খুলল না। ক্রমে ক্রমে খাবার সব শেষ হয়ে গেল, কিংবা বাইরের বাতাস কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে দীপু আর তপুর নিশ্চল দেহ বিদেশের এই অন্ধকূপে পড়ে থাকবে। কেউ কোনদিন খোঁজ পাবে না।

যদি দরজা খুলে যায়, তাহলে যারা খুলবে তারা দীপু আর তপুকে ছাড়বে না। কি করে এখানে এল তার কৈফিয়ত তলব করবে।

যদি প্রয়োজন বোধ করে, কিংবা সন্দেহ করে, তাহলে এদের মতন দুটো ছোট ছেলেকে শেষ করে দেওয়া একটা সমস্যাই নয়।

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই তপু বিছানার ওপর উঠে বসল।

দীপু, দীপু, ঘুমালি ?

দীপু ঘুমায় নি। একটা হাত চোখের ওপর রেখে আকাশ পাতাল ভাবছিল।

সে উত্তর দিল।

কিরে তপু ?

সেই প্যাকেটটা আমরা কোথায় ফেলে এসেছি ?

ওই লোকটার টেবিলের ওপর।

ওই প্যাকেটে কোনরকম চিহ্ন নেই তো ?

কি জানি লক্ষ্য করি নি। কেন ?

ভাবছি যদি কোনরকম সংকেতচিহ্ন থাকে, আর মৃত্যুর কিনারা করতে এসে পুলিসের হাতে ওই প্যাকেট পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ।

কেন, সর্বনাশ কেন ?

সর্বনাশ নয় ? পুলিস হয়তো সেই সংকেতচিহ্ন অনুসরণ করে আ লিমকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

করুক, আমাদের কি।

ওদের দলে তো অনেক লোক থাকে। তাদের রাগটা থাকবে আমাদের ওপর। যদি এখান থেকে কোনরকমে উদ্ধারও পাই, তাহলেও আর নিরাপদে দেশে পৌঁছাতে পারব না। দলের লোক আমাদের শেষ করে দেবে।

তপু চুপ করে শুনল। কিছু বলল না। বলার মতন তার কিছু ছিলও না।

অনেক রাতে, কত রাতে জানবার উপায় নেই, ওদের মনে হল কাঠের দেয়ালের ওপাশে যেন কতকগুলো মানুষের চলার শব্দ পাওয়া গেল। কারা যেন জোরে জোরে হাঁটছে।

দীপু আর তপু দুজনেই উঠে বসল।

কিছু বলা যায় না, এখনই হয়তো কাঠের পার্টিশন ফাঁক হয়ে যাবে। সেই ফাক দিয়ে পিস্তল হাতে লোকেরা এপাশে ঢুকে পড়বে।

ঠিক যেমন রহস্যকাহিনীতে ওরা পড়েছে।

তারপর! তারপর কি হবে ওরা ভাবতে পারল না। ভাবতে সাহসই হল না।

দেশের বাড়ির কথাটা মনের সামনে ভেসে উঠল। সেখানকার আত্মীয়স্বজনের কথা।

কিন্তু না, কিছুক্ষণ পরে সব নিঃঝুম। আওয়াজ থেমে গেল।

দীপু আর তপু ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীপু যখন জাগল, তখনও তপু ঘুমাচ্ছে।

তপুকে আর ডাকল না। দীপু উঠে খাবার ঘরে গেল।

জলের বোতল থেকে জল ঢেলে চোখ মুখ ধুয়ে ফেলল।

ফিরে এসে দেখল তপুও উঠেছে।

দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সারা এলাকাটা পর্যবেক্ষণ শুরু করল। একেবারে কোণে একটা স্নানের ঘরও আছে। বস্তা আড়াল ছিল বলে দেখতে পায় নি।

একভাবে দুটো দিন দুটো রাত কাটল।

অবশ্য দীপু আর তপুর হিসাবে। বাইরে দিন না রাত বোঝবার উপায় নেই।

তিনদিনের দিন বিপদে পড়ল। আলমারি খালি। খাবার সব শেষ। শুধু জলের বোতল রয়েছে।

দীপু কপাল চাপড়াল।

সর্বনাশ, কি হবে?

তপু কিছু বলল না।

দুজনেই বুঝতে পারছিল খাবার ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু দুজনেরই মনের গোপনে আশা ছিল, কিছু একটা হবে। ওরা হয়তো এই পাতাল থেকে মুক্তি পাবে।

কি হবে এইবার।

থালায় পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়ে ছিল, দুজনে সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেল। সিরাপের বোতলে জল দিয়ে তাই পান করল।

বিকালে দুজনে আলমারির প্রত্যেকটি তাক ভাল করে খুঁজল।

সব পরিষ্কার। কোথাও একটি দানাও নেই।

একটু তাড়াতাড়ি দুজনে শুয়ে পড়ল।

ভোরে উঠে আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।

বস্তায় হেলান দিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

এতদিন যে আশাটুকু নির্ভর করে বাঁচছিল, সেটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচে এই অন্ধকূপে যে তাদের মৃত্যু এ বিষয়ে আর তাদের কোন সন্দেহ নেই।

একসময়ে দুজনে উঠল।

জলের বোতলও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অবশ্য স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায় তখনও জল রয়েছে। দরকার হলে সেই জলই পান করবে।

দুজনে একচুমুকে বোতলের জল শেষ করে ফেলল।

টিন আর বোতলগুলো আছড়ে ফেলল মাটিতে। একেবারে তলায় কিছু সিরাপ, কিছু জেলি লেগে ছিল, আঙুল দিয়ে দীপু আর তপু যার নাগাল পাচ্ছিল না, কাঁচের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তাই চাটতে লাগল।

খেতে খেতে একটু পরে নোনতা স্বাদ লাগতেই দুজনে চমকে উঠল।

হাত দিয়ে দেখল, ঠোঁট কেটে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে।

জল দিয়ে দুজনে ঠোঁট ধুয়ে ফেলল।

তারপর আবার ফিরে গিয়ে বসল বিছানায়।

কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শরীর ভীষণ দুর্বল।

অনেকক্ষণ পরে তপু বলল।

দীপু, কে আগে শেষ হবে কিছু ঠিক নেই। যদি আমি আগে যাই, আর কোনরকমে তুই মুক্তি পাস, তাহলে দেখিস আমার দেহটা যেন শেয়াল কুকুরে না খায়। একটা সদ্গতি হয়।

কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তপু আর কথা বলতে পারল না।

দীপুর চোখেও জল। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

সারারাত দুজনে এপাশ ওপাশ করল। চোখে একফোঁটা ঘুম এল না।

পরের দিন দীপু উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তপু পারল না।

সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল।

তপু পাগলের মতন কাঠের দেওয়ালে ঘুষি মারছে। [পৃষ্ঠা ৭০১
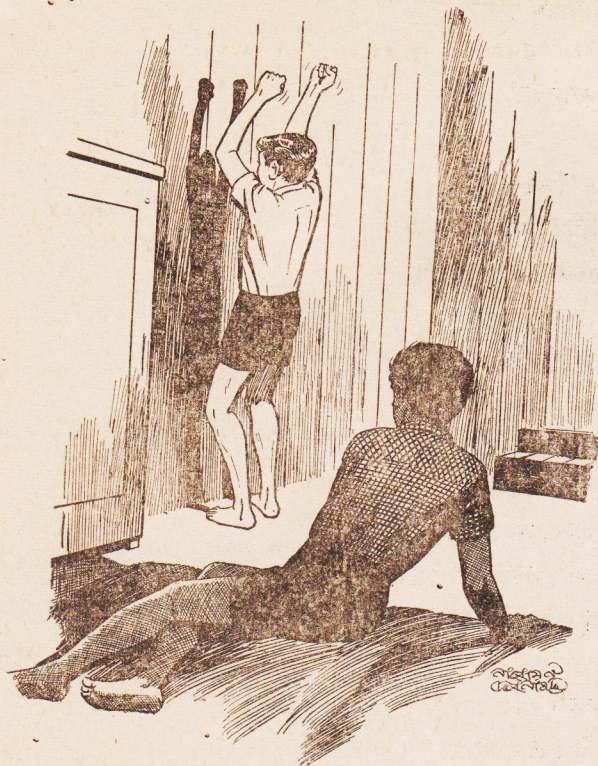
দীপু বলল, কি মনে হচ্ছে জানিস তপু।

তপু কোন উত্তর দিল না। শুধু দুটো ভ্রূ তুলল।

যদি সুড়ঙ্গের মধ্যে না থেকে, ওপরে কোন জঙ্গলের ধারে এই অবস্থা হত, তাহলে গাছের একটা পাতাও আস্ত থাকত না। সব খেয়ে শেষ করতাম।

আবার দীপু খোঁজা শুরু করল।

শুধু আলমারির ভিতরটা নয়, সারা মেঝে।

যদি অন্য দিনের খাবারের একটু অংশও মেঝের ওপর পড়ে থাকে।

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই।

নিজের জন্য দীপু অতটা ভাবছে না। ভাবছে তপুর জন্য। বয়সের অল্প ব্যবধান, ভাই হলেও দুজনে বন্ধুর মতন। ছেলেবেলা থেকে একভাবে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে।

যদি দুজনে একসঙ্গে শেষ হয়ে যায়, তাহলে ক্ষোভের কিছু নেই। একজনের চরম দুর্দশা আর একজনকে চোখে দেখতে হবে না।

কিন্তু তা কি হবে!

ঈশ্বর কি এত করুণাময় হবেন!

অন্ততঃ দীপু আর তপুর প্রতি ঈশ্বরের করুণা যে কম, সে পরিচয় তারা পেয়েছে এর আগে। কোনদিনই তিনি এদের প্রতি সদয় নন।

সদয় হলে তাদের এমন অবস্থা হবে কেন?

আচ্ছন্নের মতন দুজনে শুয়ে রইল।

মাঝরাতে হঠাৎ দুম দুম শব্দে দীপুর ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানার ওপর উঠে বসেই সে চমকে উঠল।

তপু উঠে পাগলের মতন কাঠের দেয়ালে ঘুষি মারছে।

তার চুল উস্কখুস্ক, দুটো চোখ লাল।

জড়ানো গলায় কেবল বলছে।

খোল, খোল, খোল।

দীপু বুঝতে পারল তপু প্রকৃতিস্থ নয়। অনাহারে তার মাথার গোলমাল হয়েছে।

দীপু লাফিয়ে গিয়ে তপুকে জড়িয়ে ধরল।

এই তপু, তপু, কি করছিস!

তপু কোন উত্তর দিল না। দীপুর দিকে ফিরেও দেখল না।

দেয়ালে অনবরত ঘুষি মারতে লাগল।

এত জোরে তপু ঘুষি মারছে, একটু পরেই তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

দীপু তপুকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল দেয়ালের কাছ থেকে।

পারল না। তপুর গায়ে যেন অসীম শক্তি।

দীপু প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সরিয়ে আনার জন্য টানল।

দুজনেই জড়াজড়ি করে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

পাছে গড়িয়ে আরো নীচে পড়ে যায়, সেই ভয়ে দীপু জোরে সিঁড়ির একটা ইট আঁকড়ে ধরল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে ইটটা খসে পড়ল।

ফাঁকের মধ্যে চকচকে একটা হাতল।

কিছু না ভেবেই দীপু হাতলটা ধরে টানল।

ঘড়ঘড় শব্দে কাঠের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল। [ক্রমশঃ]

বিশ্বাস কর বা না কর

স্লিপ্লে

স্টিফেন সাউথ নামে একজন ইংরেজ লেখক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার তারিখ আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালে ভ্যালিয়েন্ট ক্লে নামে একটা বই প্রকাশ করেন। সেই বইতে লেখেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে বাধবে।
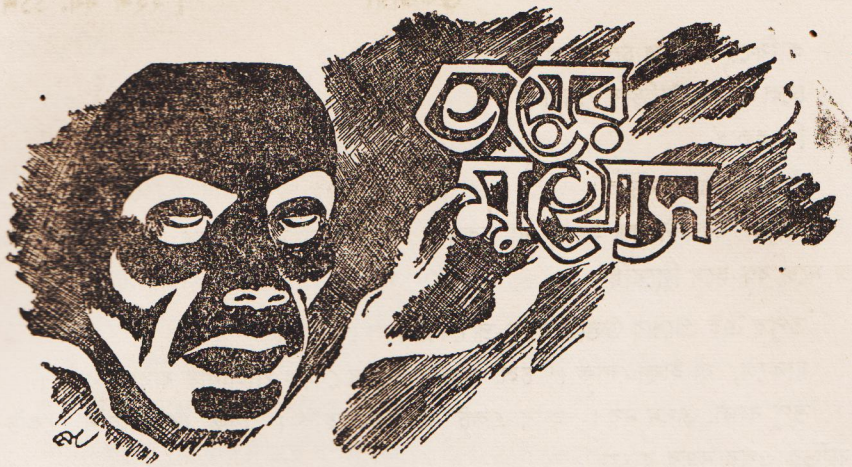
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দু তিন মিনিট তপু আর দীপু কোন কথা বলতে পারল না। নির্বাক্ বিস্ময়ে সেই ফাঁকের দিকে চেয়ে রইল।

তপু ছুটে এপারে আসছিল, দীপু বাধা দিল।

দাঁড়া তপু, এখন যাস নি। আমি আগে উঁকি দিয়ে চারদিক দেখে আসি।

তপু বস্তায় হেলান দিয়ে বসল।

দীপু সাবধানে পা ফেলে দেয়ালের কাছে এল।

মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সমস্ত জার অদৃশ্য। সাপের চিহ্নমাত্রও নেই।

তার মানে, দীপু আর তপু যখন সুড়ঙ্গপুরীতে ছিল, তখন নিশ্চয় কেউ এসেছিল এখানে।

দীপু পাশের ঘরে গেল।

আরো তাজ্জব ব্যাপার।

মৃতদেহ নেই। সব পরিষ্কার।

দীপু আবার ফিরে গিয়ে ফাঁকের কাছে দাঁড়াল।

ভিতর দিকে চেয়ে ডাকল।

এই তপু, বাইরে চলে আয়।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তপুর চলার শক্তি ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু মুক্তির আনন্দে তপু সব যন্ত্রণা ভুলল।

লাফিয়ে এপারে চলে এল।

চলে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল

কি হল ?

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা ফাঁকটা বন্ধ হচ্ছে না কেন ? আমরা যখন ভিতরে ঢুকেছিলাম, তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে দীপু ভ্রূ কোঁচকাল।

যাকগে, যা ইচ্ছা হোক। চল, আমরা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করি।

তপু বলল, এখন নয়। আর একটু অন্ধকার হোক। কিছু বলা যায় না, কেউ হয়তো এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

দীপু আর তপু এদিকের ঘরে এসে দাঁড়াল।

যেখানে মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেখানে ঝুঁকে পড়ে দেখল। মেঝেটা যেন চকচক করছে। তেল পড়লে যেমন হয়।

এদিকে একটা ছোট ঘর।

সেখানে ঢুকেই দুজনে লাফিয়ে উঠল।

র‍্যাকের ওপর সারি সারি ডিম। খোঁজ করলে আরো কিছু হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

দেয়াল আলমারিটা খুলে দুজনে দেখল। কোথাও কিছু নেই।

র‍্যাকে দেশলাই পাওয়া গেল।

এ ঘর থেকে দীপু পুরোনো কাগজ যোগাড় করল। খালি টিন।

এক একজন গোটা চারেক করে ডিমসেদ্ধ খেয়ে একটু ধাতস্থ হল।

তারপর একেবারে কোণের ঘরে এসে দুজনে বসল।

তপু বলল, একদিন আমরা যে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম, সেই-দিনই বোধ হয় কেউ এসে সাপসুদ্ধ জার আর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

কারা সরাবে ? পুলিসের লোক ?

পুলিসের লোক নাও হতে পারে। হয়তো যে লোকটা মারা গেছে, তাদের বিপক্ষ দলের কেউ। যাতে কেউ লাশ পরীক্ষা না করতে পারে, সেইজন্য।

তপু গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে দেখে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

কিরে, কি ভাবছিস ?

আমি ভাবছি ফাটলটা বন্ধ হচ্ছে না কেন ? কলকবজা কি গোলমাল হয়ে গেল !

থাক খোলা, আমাদের কি !

উহুঁ, তপু মাথা নাড়ল, পরীক্ষা করে একবার দেখতে হচ্ছে।

সেকি রে, তুই আবার ওর মধ্যে ঢুকবি নাকি ?

আবার, মাথা খারাপ।

তপু উঠে এদিক ওদিক ঘুরে একটা মোটা কাঠের টুকরো নিয়ে এল।

সেটা দিয়ে সজোরে সিঁড়ির ধাপের ওপর আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় করে শব্দ। দেয়ালের ফাকটা বন্ধ হয়ে গেল।

তপু ঠিক সময়ে সরে এসেছিল।

সে নিরাপদ্ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ঠিক তাই ভেবেছি।

কি ভেবেছিস ?

এদিক থেকে ছিটকে যখন আমরা ওদিকে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন সিঁড়ির ওই ধাপের ওপর পড়ার জন্য দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধাপের ওপর ভার পড়লে ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যায়, এইরকম কিছু কলকবজার ব্যাপার আছে।

ইতিমধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

দীপু বলল, চল, এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি।

তপু উঠে পড়ল।

দাঁড়া, বাকি ডিমকটা সঙ্গে নিই। কখন কি অবস্থায় থাকি কিছু বলা যায় না। সঙ্গে রসদ থাকা দরকার।

একটা কাগজের মধ্যে ডিমগুলো নিয়ে তপু দীপুর পাশে এসে দাঁড়াল।

কিছু বলা যায় না, আবার নতুন কোন্ বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে দুজনে। এ দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বিপদ্ চলেছে। প্রাণে যে বেঁচে আছে, এই যথেষ্ট।

এগোতে গিয়েই দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দরজা বন্ধ।

মনে পড়ে গেল, এ ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দীপু বলল।

এখন উপায়! কি করে বাইরে যাব!

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তপু বলল।

নিশ্চয় কোথাও কোন কলকবজা আছে। সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কি করে করবি ?

মনে করে দেখ, প্রথম এ ঘরে ঢুকে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

একটু পরেই তপুর নিজেরই মনে পড়ে গেল।

আমি হোঁচট খেয়েছিলাম, টাল সামলাতে দেয়ালের এই মাদুরটা আঁকড়ে ধরি, এই না ?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

তপু দেয়ালের মাদুরটা সরাল। ছোট একটা হাতল নীচের দিকে নামানো।

সে হাতলটা ওপর দিকে ঠেলে দিতেই কাজ হল।

কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা খুলে গেল।

দুজনে আর এক তিল বিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে এল।

মাঠের মধ্যে এসে এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

ধারে কাছে কাউকে দেখা গেল না।

তপু বলল, এরপর কোথায় যাব ?

দীপু বলল, আমাদের নদীর ওপারে যেতে হবে। শহরে। তারপর ভাগ্যে যা আছে, হবে।

চল।

মেঠো পথ ধরে দুজনে এগোল।

কয়েক পা গিয়েই তপু দাঁড়াল। দীপুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ওই যে ঝোপ দেখছিস ?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

সুড়ঙ্গপুরীর বাতাস বেরোবার নলটা ওর মধ্যে আছে, তাই চট্ করে কারো নজরে পড়ে না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নদীর ধারে যখন এসে পৌঁছল, বেশ রাত হয়েছে।

কাছাকাছি একটাও সাম্পান নেই।

ঘাটের ওপর তপু আর দীপু বসল।

চোখ রইল জলের দিকে। যদি কোন সাম্পান চোখে পড়ে ডাকবে।

আধঘণ্টার ওপর কিছু দেখতে পেল না।

একটা মোটর লঞ্চ তীরবেগে জল কেটে বেরিয়ে গেল।

তারপর ঢেউয়ের দোলার ওপর একটা সাম্পান দেখা গেল।

সাম্পানটা এদিকেই আসছে।

দুজনেই মাথার ওপর হাতটা তুলে চেঁচাতে লাগল।

মাঝি দেখতে পেয়েছিল। সাম্পানটা ঘাট বরাবর এনে রাখল

এখানে সব মাঝিই ভারতীয়। চট্টগ্রামের অধিবাসী, কাজেই কথা বলতে কোন অসুবিধা হল না।

মাঝিকে দীপু বলল, আমরা ওপারে যাব।

সঙ্গে বড় কেউ নেই ?

তপু ঘাড় নাড়ল, না।

ঠিক আছে, চলে এস।

সাম্পান যখন নদীর মাঝামাঝি, তখন দীপু জিজ্ঞাসা করল।

ওপারের নাম কি ?

বৈঠা চালাতে চালাতে মাঝি বলল, ডালা।

তারপরই কি খেয়াল হতে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোমরা এদেশে নতুন বুঝি ?

দীপু মাথা দোলাল, অর্থাৎ হাঁ।

মাঝি আবার প্রশ্ন করল।

এখানে থাক কোথায় ?

দীপু একটু ঢোঁক গিলে বলল।

জেটির কাছে এক হোটেলে আছি।

কোন্ জেটি ?

দীপু আর তপু উত্তর দেবার আগে মাঝি নিজেই বলল।

ব্রুকিং স্ট্রীট জেটির কাছে তো ? বুঝেছি, রয়েল হোটেল।

দীপু আর তপু কথা বাড়াল না। বুঝতে পারল কথা বাড়ালেই বিপদে পড়বে।

সাম্পান এপারে ঘাটে এসে লাগল।

কাদায় একটা বাঁশ পুতে সাম্পান বেঁধে মাঝি বলল।

দাও ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। অনেক রাত হয়েছে।

তপু আর দীপু নিজেদের পকেট থেকে পয়সা বের করল। আট আনা আর চার আনা। সবসুদ্ধ বারো আনা। এই পয়সা নিয়েই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

বারো আনা পয়সা মাঝির হাতে দিতেই সে রেগে উঠল।

তার মানে ? এত রাতে পার করালাম, তাও দুজনকে। ভাড়া মাত্র বারো আনা।

আমাদের কাছে আর একটি পয়সাও নেই, বিশ্বাস কর।

দরদস্তুর না করে সাম্পানে ওঠ কেন? আমি দু টাকা ভাড়া চাই।

দীপু মাঝির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি বরং আমাদের পকেটে হাত দিয়ে দেখ। যদি কিছু পাও, নিয়ে নিও।

মাঝি দুজনের দিকে ভাল করে দেখল, তারপর বলল।

ওই কাগজের ঠোঙায় কি?

তপু ভয়ে ভয়ে বলল, ডিম।

কটা?

গোটা আষ্টেক আছে।

দাও ওগুলো আমাকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি খপ্ করে তপুর হাত থেকে কাগজের ঠোঙাটা কেড়ে নিল।

বাঁশ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল।

যাও, যাও, নেমে পড়। আমি সাম্পান ছাড়ব।

অগত্যা দুজনে লাফিয়ে কাদার ওপর নেমে পড়ল।

কাদা ভেঙে রাস্তার ওপর এসে উঠল।

রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই।

দীপু রাস্তার একপাশে বসে পড়ে বলল

এখন উপায়?

উপায় আর কি। শহরের দিকে হাঁটা যাক। কোনরকমে যদি সেই জেটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, আর দেখি কোন জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে পায়ে ধরে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করব।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

শহর তো অনেকটা পথ।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।

মাঝে মাঝে দু একটা কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। গোটাকয়েক কুকুর তাদের তেড়েও এল। ঢিল ছুঁড়ে দুজনে তাদের তাড়াল।

পথে বারদুয়েক বিশ্রাম করে নিল।

কিছুক্ষণ পরে দীপুর খেয়াল হল।

দেখ তপু, পিছনে একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

তপু চেয়ে দেখল।

আলোটা স্থির নয়, চলমান।

দুজনে একপাশে সরে এসে দাঁড়াল। যাতে আলোটা এগিয়ে তাদের পাশ কাটাতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, আলোটা এগোল না। সমান দূরত্ব রেখে একভাবে জ্বলতে লাগল

কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না তো?

তার আর আশ্চর্য কি।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুজনে আবার চলতে আরম্ভ করল।

একজায়গায় অনেকগুলো গাছের জটলা। ডাল বেয়ে কিছু লতাগাছ উঠে জায়গাটা ঝুপসি অন্ধকার করে রেখেছে।

কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই দীপু আর তপুর কানে একটা গোঙানির শব্দ এল।

একটা কচুঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখেই দুজনে চমকে উঠল।

কোথায় যেন কে কাঁদছে?

দীপু বলল। রাত্রে শকুনের বাচ্চা ঠিক ওইরকমভাবে কাঁদে। তাড়াতাড়ি চল।

তাড়াতাড়ি যেতে গিয়েও কিন্তু পারল না।

দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

মানুষের গোঙানির শব্দ। যন্ত্রণায় কে যেন ছটফট করছে। খুব কাছে।

একবার দেখে এলে হয়।

তপু বলল।

আবার কোন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু সাবধান করে দিল।

উঁকি দিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি।

একটা কচুঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখেই দুজনে চমকে উঠল।

আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। আবছা সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

একটা লোক ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে চাপ চাপ রক্ত।

সেও বোধ হয় দীপু আর তপুকে দেখতে পেয়েছিল।

অনেক কষ্টে একটা হাত তুলে দুজনকে ডাকল।

একটু ইতস্ততঃ করে দীপু আর তপু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখের নীচেটা মাফলার দিয়ে ঢাকা। দুটো চোখে যন্ত্রণার ছায়া।

হাত বাড়িয়ে দীপুর একটা হাত ধরল, আর একটা হাত প্রসারিত করে দিল তপুর দিকে।

তপু তার একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

দুজনের সাহায্যে লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটু দূরে দেখিয়ে জড়ানো গলায় কি বলল।

যেদিকে লোকটা আঙুল নির্দেশ করল সেদিকে চোখদুটো কুঁচকে দুজনে দেখল। কতকগুলো গাছের ফাঁকে একটা সাদারঙের বাড়ি।

লোকটা ইঙ্গিত করে যা বলল, তাতে দীপু আর তপু এইটুকু বুঝতে পারল লোকটা ওই বাড়িতে যেতে চায়। আর সেজন্য তার দীপু আর তপুর সাহায্যের প্রয়োজন।

লোকটার যেমন অবস্থা, একলা হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

দীপু আর তপু লোকটার হাত নিজেদের কাঁধের ওপর রেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। জোরে চললে পাছে লোকটার ঝাকুনি লাগে সেজন্য যথাসম্ভব সতর্ক হল।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে তপু একবার পিছন ফিরে দেখল।

ঠিক ঝোপটার পাশে আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে।

দীপুকে কথাটা বলতে গিয়েই তপু থেমে গেল।

লোকটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

তপুরই দোষ। সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে দেখতে গিয়ে লোকটার হাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু দীপু হাত রাখতেই খুলে গেল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে ভিতরে ঢুকল না।

দরজা সম্বন্ধে দীপু আর তপুর ভয় ছিল।

তাই দুজনে দরজাটা ভালো করে পরীক্ষা করে তবে বাড়ির মধ্যে পা রাখল। হঠাৎ আবার দরজাটা না বন্ধ হয়ে যায়।

সে রকম কিছু হল না। একটা বড় সোফার ওপর লোকটাকে সাবধানে শুইয়ে দিয়ে দুজনে বেরোতে গিয়েই বাধা পেল।

লোকটা হাততালি দিল।

ওঁরা ফিরতে হাতের ভঙ্গীতে জল চাইল। জল যে পাশের ঘরে পাওয়া যাবে তাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

পাশে ছোট একটা ঘর। গ্লাস, প্লেট সাজানো। মাঝখানে টেবিল, চেয়ার। বোধ হয় খাবার ঘর।

তপু বলল, এ বাড়িটা বোধ হয় লোকটারই হবে, কিন্তু কে ওভাবে মাথায় চোট মারল ?

দীপু গ্লাসে জল ভরতে ভরতে বলল, বোধ হয় ডাকাতরা আক্রমণ করে পয়সাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। দয়া করে প্রাণে মারে নি।

লোকটাকে জল দিয়ে যদি কিছু খেতে চাই, নিশ্চয় না বলবে না।

দেখা যাক।

দুজনে আবার এদিকের ঘরে এল। দীপুর হাতে জলের গ্লাস। পিছনে তপু।

এ ঘরে ঢুকেই দুজনে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

দীপুর হাত থেকে ঝনঝন শব্দে গ্লাসটা মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

সত্যবাদী

শ্রীসুবোধকুমার পাল

বাংলার শিক্ষকমশাই ক্লাসে ঢুকেই হেসে সকল ছেলেদের বললেন—একদিনের মারেতেই কাজ হয়েছে। কাল দেরি করে আসার জন্য বিনয় মার খেয়েছিল, তাই আজ দেখলাম বিনয় সকলের আগে স্কুলে আসলো! তারপর শিক্ষকমশাই বিনয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন—কি বিনয় এত তাড়াতাড়ি এসে কি করছিলে ?

বিনয় মাথা নীচু করে জবাব দিলো—স্যার, আপনি একদিন বলেছিলেন যে যে-রকম তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতে তাই আজ তাড়াতাড়ি এসে আপনার চেয়ারের পায়ার তলায় কুলের বিচি রাখছিলাম।
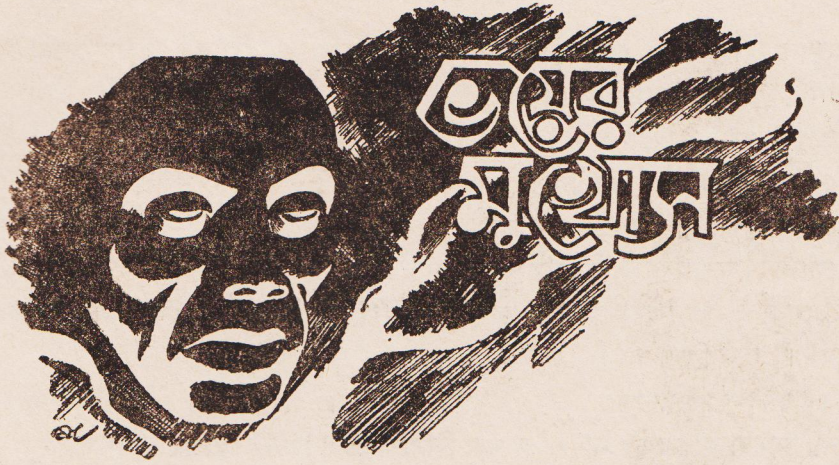
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে কাতরাচ্ছিল, সে যে এভাবে এর মধ্যে রিভলভার হাতে নিয়ে বসবে সেটা দীপু আর তপু ধারণাও করতে পারে নি।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের কথা, এ লোকটার চেহারার সঙ্গে নদীর ওপারে প'ড়োবাড়িতে চেয়ারের ওপর মৃত লোকটার চেহারার কোন প্রভেদ নেই।

তাহলে সে লোকটা কি মৃতের ভান করেছিল ?

তাই বা কি করে সম্ভব !

গায়ে হাত ঠেকতেই লোকটা যেভাবে মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছিল, সেটা জীবিত লোকের পক্ষে কোনরকমেই সম্ভব নয়।

দীপু আর তপু এগোবার চেষ্টা করতে গিয়েই থেমে গেল।

লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল।

সাবধান, শয়তানের বাচ্ছারা, আর এক পা এগোলেই খতম করে দেব। আমার রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। একটু শব্দ হবে না। শুধু সামান্য একটু ধোঁয়া, ব্যস, কাজ শেষ।

দুজনে দরজার গোড়ায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলতে লাগল।

সত্যি কথা বল, আমার যমজ ভাইকে কে শেষ করেছে ?

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল। তাহলে যে লোকটা মারা গেছে, সে এর যমজ ভাই। তাই চেহারায় এমন মিল।

তপু কাঁপতে কাঁপতে বলল।

কে শেষ করেছে, আমরা কি করে জানব।

সে আর কথা শেষ করতে পারল না।

লোকটা মেঝের ওপর সজোরে বুট ঠুকল।

চোপরাও, মিথ্যাবাদী কেউটের ছানা! তোরা আ লিমের চর সেটা আমার জানতে বাকি নেই। ঠিক কিনা বল?

এবার দীপু মাথা নাড়ল।

না, আমরা কারুর চর নই। আমরা বিদেশে এসে বিপদে পড়েছি।

তাহলে প'ড়োবাড়ির মধ্যে কি করতে ঢুকেছিলি?

আমরা একটা প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিসের প্যাকেট?

তা জানি না।

কে পাঠিয়েছিল?

দীপু আর তপু চুপ করে রইল।

লোকটা বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ করে থেকে বিশেষ লাভ হবে না। দুটো গুলিতে দুজনের খুলি ফাটিয়ে দেব। উত্তর দে।

তপু বলল।

আ লিম পাঠিয়েছিল।

এবার লোকটা প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল। পৈশাচিক হাসি। সে হাসিতে মনে হল বাড়ির জানলা দরজাগুলোও যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

তবু তোরা বলতে চাস, তোরা আ লিমের চর নস। আ লিম কেন প্যাকেট পাঠিয়েছিল জানিস?

একটু থেমে, উত্তরের অপেক্ষা না করে, লোকটাই বলতে আরম্ভ করল।

প্যাকেট পাঠানো একটা ছল। তোদের এই জন্য পাঠিয়েছিল যে তোরা ফিরে এসে বলবি যে লোকটা মরে গেছে, তাই কাউকে প্যাকেটটা দিয়ে আসতে পারিস নি। লোকটা সত্যি মরেছে কিনা, সেই খবরটা শুধু আ লিম তোদের মারফত জানতে চেয়েছিল। তার নিজের যাবার সাহস ছিল না, পাছে পুলিসের হাতে পড়ে, কিংবা আমাদের হাতে পড়ে।

লোকটা জামার হাতায় মুখটা মুছে নিয়ে বলল।

ঠিক সময়ে খবর পেলে আ লিমের অবশ্য নিস্তারও ছিল না। আমি যে আবার একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খবর পেলাম, ভাইকে শেষ করে দিয়েছে। এ খবরও পেলাম দুটো পুঁচকে ছোঁড়া ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু বের হতে কেউ দেখে নি। এ কদিন তোরা কোথায় ছিলি ?

কোথায় ছিল বলতে গিয়েই দীপু থেমে গেল। তারা যে এদের পালাবার গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখেছে সে কথা জানতে পারলে লোকটা হয়তো আরও খেপে যাবে।

হাতে তো রিভলভার রয়েইছে, আঙুলের একটু কারসাজি, ব্যস, তাদের দুটো দেহ মেঝেয় লুটাবে।

তাই দীপু একটু ভেবে নিয়ে বলল।

কি করব—চারদিকে সাপ। আমরা ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বসে ছিলাম।

সাপ তো কাঁচের জারের মধ্যে।

বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ, তপু বলল, যেভাবে জারের ওপর ছোবল দিচ্ছিল।

হুঁ, লোকটাও যেন কি ভাবল, তারপর বলল।

আমি নদীর ওপারে কদিন পাহারা দিচ্ছি। প্রায় সারা দিন রাত। জানি, একদিন তোদের এপারে আসতেই হবে। আজ তোদের বাগে পেয়েছি।

দীপু বলল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাদের কোন দোষ নেই। এসব ব্যাপারের আমরা কিছু জানি না। আমরা জাহাজ থেকে নেমে আ লিমের কবলে পড়েছি।

আবার লোকটা হাসল।

ছাদফাটানো হাসি।

বলল, ওসব মায়াকান্নায় আমি ভুলি না। তোদের নিস্তার নেই। আ লিমের দলের কারো পরিত্রাণ নেই। নে, কে তোদের ইষ্টদেবতা তার নাম কর। দু মিনিট সময় দিচ্ছি।

এবার দীপু আর তপু দুজনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমাদের কথা বিশ্বাস কর। আমরা তোমাকে একটুও মিথ্যা বলি নি।

চোপ। একটা কথাও নয়।

চমকে উঠে দীপু আর তপু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

ইষ্টদেবতার নাম তপু আর দীপুর জানা নেই।

দীপুর চোখের সামনে তার বাবা আর মার চেহারা ভেসে উঠল। তপুর মনে এল তার অসহায় মায়ের ছবি।

আর জীবনে কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তারা জানতেও পারবে না, কিভাবে বিদেশে বেঘোরে দুটি কিশোর প্রাণ হারাল।

হয়তো কাজ শেষ করে এই নরাধম দুজনের দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তারপর মাংসের গন্ধে কুকুর শেয়ালের দল সেই দেহ বের করে নিয়ে নিজেদের ভোজে লাগাবে।

হয়েছে। এবার দাঁড়া সোজা হয়ে।

রুক্ষ, কঠিন কণ্ঠস্বর।

দুজনে দুজনকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুজনের চোখ জলে ভরতি। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব অস্পষ্ট।

আর দু এক মিনিটের মধ্যে চোখের সামনে চিরদিনের মতন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।

দুম্।

আচমকা একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র বাতি নিভে গেল।

ভারি একটা জিনিস পড়ার আওয়াজ।

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না। মনে হল দুটো লোক যেন ধস্তাধস্তি করছে।

প্রাণপণ বিক্রমে। মরণপণ করে।

অন্ধকারে দীপু হাত বাড়িয়ে তপুর হাতটা আকর্ষণ করল।

পালিয়ে যাবার ইঙ্গিত।

দুজনে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে বাইরে চলে এল।

বাইরে খুব অন্ধকার নয়। তরল জ্যোৎস্নায় সব কিছু প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দুজনে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রাস্তার কাছবরাবর এসে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তপু বলল।

না, রাস্তার দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। তার চেয়ে আয় আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

একটু ইতস্ততঃ করে দুজনে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বিরাট কতকগুলো গাছ। বোধ হয় বট আর অশথ। বড় বড় ঝুরি নেমেছে ডাল থেকে। তলায় অনেক আগাছা।

যদি সাপখোপের উপদ্রব না থাকে তাহলে লুকাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

রাস্তা বেশী দূরে নয়।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে একটা ঝোপের পাশে বসল।

দিনের আলো ফুটুক, তারপর রাস্তায় বের হবে।

বোধ হয় এক ঘণ্টারও বেশী

দুজনে দেখল বাড়ির দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।

ঠিক এইরকম আলো ওদের অনুসরণ করছিল।

দুজনে বুকে হেঁটে হেঁটে রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে বসল।

কাছে আসতে বুঝতে পারল একটা সাইকেল।

এতক্ষণ সাইকেলটা খুব জোরে আসছিল, রাস্তার কাছে আসতেই তার গতি কমে গেল।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আরোহী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখল, তারপর দ্রুতবেগে চলে গেল শহরের দিকে।

বাড়ির দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।

সাইকেল পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

লোকটাকে দেখেছিস ?

তপু ঘাড় নাড়ল।

হুঁ, আ লিম।

তার মানে, এ লোকটাও হয়তো খুন হল।

খুন ?

নিশ্চয়, লোকটাকে খুন না করে আ লিম বের হত না।

আ লিম আমাদের নিয়ে গেল না সঙ্গে করে ?

এতক্ষণ বোধ হয় বাড়িতে আমাদেরই খোঁজ করছিল। রাস্তায় এসেও এদিক ওদিক দেখছিল আমাদের খোঁজে।

তপু বলল।

আমাদের দেখতে না পেয়েছে ভালই হয়েছে, আ লিমের ফাঁদে আর নিজেদের জড়াতে চাই না।

দীপু চোখ বন্ধ করে হাই তুলল।

ক্লান্তিতে দুজনের শরীর ভেঙে পড়ছে। চোখ খুলে রাখাই দুষ্কর।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুজনে চোখ বুজল।

ঘুম ভাঙল পাখির কলরবে। ভোর হয়েছে। রাস্তা দিয়ে দু একজন লোক চলছে। সকলেরই মাথায় ঝুড়ি। ঝুড়িভরতি আনাজ তরকারি।

গ্রাম থেকে তরিতরকারি নিয়ে বোধ হয় শহরে যাচ্ছে। বিক্রির জন্য।

দুজনে উঠে রাস্তায় এল।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

শহর এখান থেকে কতদূর ?

লোকটা বর্মী, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হাত মুখ নেড়ে কি বলতে বলতে চলে গেল।

বোঝা গেল এদের ভাষা লোকটা বুঝতে পারল না।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল। পেটের মধ্যে আবার মোচড় দিচ্ছে। কিছু একটু খেতে পেলে হত।

ভাগ্য ভাল।

এবার যে লোকটা দুধের বালতি নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল, তাকে হিন্দুস্থানী বলেই মনে হল।

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

এখান থেকে শহর কতদূর ?

কোন্ শহর ?

তপু বলল, রেঙ্গুন।

নামটা সারেংদের মুখে জাহাজে সে শুনেছিল।

রেঙ্গুন ? বিস্ময়ে লোকটা দুটো চোখ কপালে তুলল, তোমরা হেঁটে রেঙ্গুন যাবে নাকি ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এ জায়গার নাম কেমেনডাইন। তার চেয়ে এক কাজ কর, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা রাস্তা পাবে, সেটা ধরে গেলে স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে বরং ট্রেনে চেপে যাও।

লোকটা আর দাঁড়াল না। তীরবেগে ছুটে চলে গেল।

দীপু বলল, ট্রেনে তো চাপব, কিন্তু ভাড়া ? শেষকালে হাজতে পুরবে।

তপু কি ভাবল, তারপর বলল, স্টেশনের কাছে হয়তো খাবারের দোকান থাকবে। আমাদের কাছে যা পয়সা আছে তাতে দু একটা পাঁউরুটি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিছু একটু পেটে না পড়লে চোখে অন্ধকার দেখছি।

স্টেশন পর্যন্ত আর যেতে হল না পথেই পাওয়া গেল।

একটা টিনের চালা। গোটা কয়েক বেঞ্চ আর টেবিল পাতা। গোটা কতক লোক মগে করে চা খাচ্ছে। পোশাক দেখে শ্রমিকশ্রেণীর বলেই মনে হল।

কোণের দিকে একটা বেঞ্চে দীপু আর তপু বসে পড়ল। চায়ের অর্ডার দিতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, তাদের কাছে একটি পয়সাও নেই। সব পয়সা সাম্পানের মাঝিকে দিয়েছে।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এ রাস্তা দিয়ে দু একটা লরি গেলে বড় ভাল হয়। থামিয়ে আমরা উঠে পড়ি।

তপু হেসে বলল, খিদিরপুরে যাওয়ার মতন ?

দীপু ঘাড় নাড়ল। হুঁ।

কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করেও কোন লরির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। একটা গরুর গাড়ি এল, তরকারিতে ঠাসবোঝাই। তিল ধারণের স্থান নেই।

সেটাতে ওঠা অসম্ভব।

বাধ্য হয়েই আবার হাঁটতে শুরু করল।

একটু পরেই ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। মনে হয় এতক্ষণ বোধ হয় থেমে ছিল, এইবার ছাড়ছে।

তার মানে, স্টেশন খুব দূরে নয়।

সত্যিই তাই।

একটা বাঁক ঘুরতেই স্টেশন দেখা গেল। সামনে অনেকগুলো রিক্‌শা আর মোটরের ভিড়। কিছু লোকও ছোটাছুটি করছে।

দুজনে স্টেশনের এলাকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা সান্ত্বনা, এখানে অনেক লোকজন রয়েছে, কেউ হঠাৎ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

দীপু আর তপু লোহার বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর চলে এল। অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা রয়েছে। তার একটার ওপর গিয়ে বসল।

দীপুই বলল।

এখানে বসে ট্রেনের চলাচল লক্ষ্য করি। যে ট্রেনে দেখব ভিড় বেশী, সেটাতে চড়ে বসব। তাহলে বিনা টিকেটে শহরে গিয়ে পৌঁছাতে পারব।

তপু কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

অনেকগুলো ট্রেন এল, গেল, কিন্তু দুজনে সাহস করে চড়তে পারল না।

এদিকে বেলা বাড়ছে। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে প্ল্যাটফর্মে।

কে তোমরা ?

গম্ভীর আওয়াজে দুজনেই চমকে মুখ ফেরাল।

রেলের পোশাক পরা একজন টিকেট চেকার এসে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক বাঙালী। পরিষ্কার উচ্চারণ।

দীপু বলল, আমাদের পয়সা নেই, তাই ট্রেনে চড়তে পারছি না।

যাবে কোথায় তোমরা ?

শহরে।

তার মানে রেঙ্গুনে। সেখানে কে আছে ?

এবার দীপু আর তপু কথা বলতে পারল না। কি বলবে ? কে আছে শহরে ? কার কাছে তারা যাবে ?

কি হল ? একেবারে থেমে গেলে যে ?

আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, মানে বাংলাদেশ থেকে।

তোমাদের চেহারা দেখে সেই রকমই মালুম হচ্ছে। ওঠ, এস আমার সঙ্গে।

দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে উঠল।

তপু বলল, কোথায় ?

শ্বশুরবাড়ি নিশ্চয় নয়। গেলেই বুঝতে পারবে।

দুজনকে নিয়ে টিকেট চেকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল।

টিকেটঘরের সামনে প্রহরারত একজন বর্মী পুলিস ছিল, তাকে হাত নেড়ে ডাকল।

পুলিস আসতে তাকে চাপাগলায় ফিসফিস করে কি বলল।

পুলিস মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

টিকেট চেকারের কান বাঁচিয়ে দীপু বলল।

এবার উপায় ?

তপু মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, ঠিক আছে, পুলিসেই দিক। আর এভাবে ঘুরতে পারছি না। যা বলবার পুলিসের কাছেই বলব।

একটু পরেই পুলিস ফিরে এল। হেঁটে নয়, লাল একটা ভ্যানে চড়ে। ভ্যানের মধ্যে থেকেই দীপু আর তপুকে ইশারায় ডাকল।

দীপু আর তপু একটু ইতস্ততঃ করে ভ্যানে উঠে বসল।

দরজা বন্ধ হতে সব অন্ধকার। বাইরের কিছু বোঝবার উপায় নেই।

শুধু এইটুকু বোঝা গেল, মোটর খুব দ্রুতবেগে বাঁকের পর বাঁক পার হচ্ছে।

একসময় ভ্যান থামল।

পুলিস নেমে দরজা খুলে দিল।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে কতকগুলো পুলিস ঘুরছে। গোটা ছুয়েক মোটর সাইকেলও রয়েছে।

নামো। নামো।

পুলিসের হাত নাড়ার ভঙ্গীতে মনে হল নামতে বলছে। দীপু আর তপু নেমে পড়ল।

সামনের ঘরে বিরাটবপু একটি পুলিস অফিসর। তার কানে কানে পুলিস কি বলতেই সে হাত দিয়ে কোণের একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

সেইদিকেই বোধ হয় হাজত। দীপু আর তপুকে হাজতে কাটাতে হবে।

ঠিকই তাই, এবার পুলিস দীপু আর তপুর সার্টের কলার ধরে টেনে নিয়ে চলল।

বাধা দিয়ে লাভ নেই, তাহলে নির্যাতন শুরু হবে।

দীপু আর তপু ভাবল, রাখুক হাজতে, আপত্তি নেই, শুধু যেন খেতে দেয়। না খেতে দিয়ে না মারে।

না হাজত নয়, ছোট একটা ঘর।

দরজা খুলে তার মধ্যে দুজনকে ঢুকিয়ে পুলিস সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

হাসির শব্দে দুজনে চমকে মুখ তুলল, তারপর আর অনেকক্ষণ চোখ নামাতে পারল না।

কোণের দিকে একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে আ লিম।

দীপু বলল, সর্বনাশ, তাহলে সবটাই ফাঁকি। টিকেট চেকার, পুলিস সব নকল? আমাদের ধরে আনার ফন্দি!

কোথায় পালিয়েছিলি শয়তানের বাচ্চারা? আ লিম বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

[ক্রমশঃ]
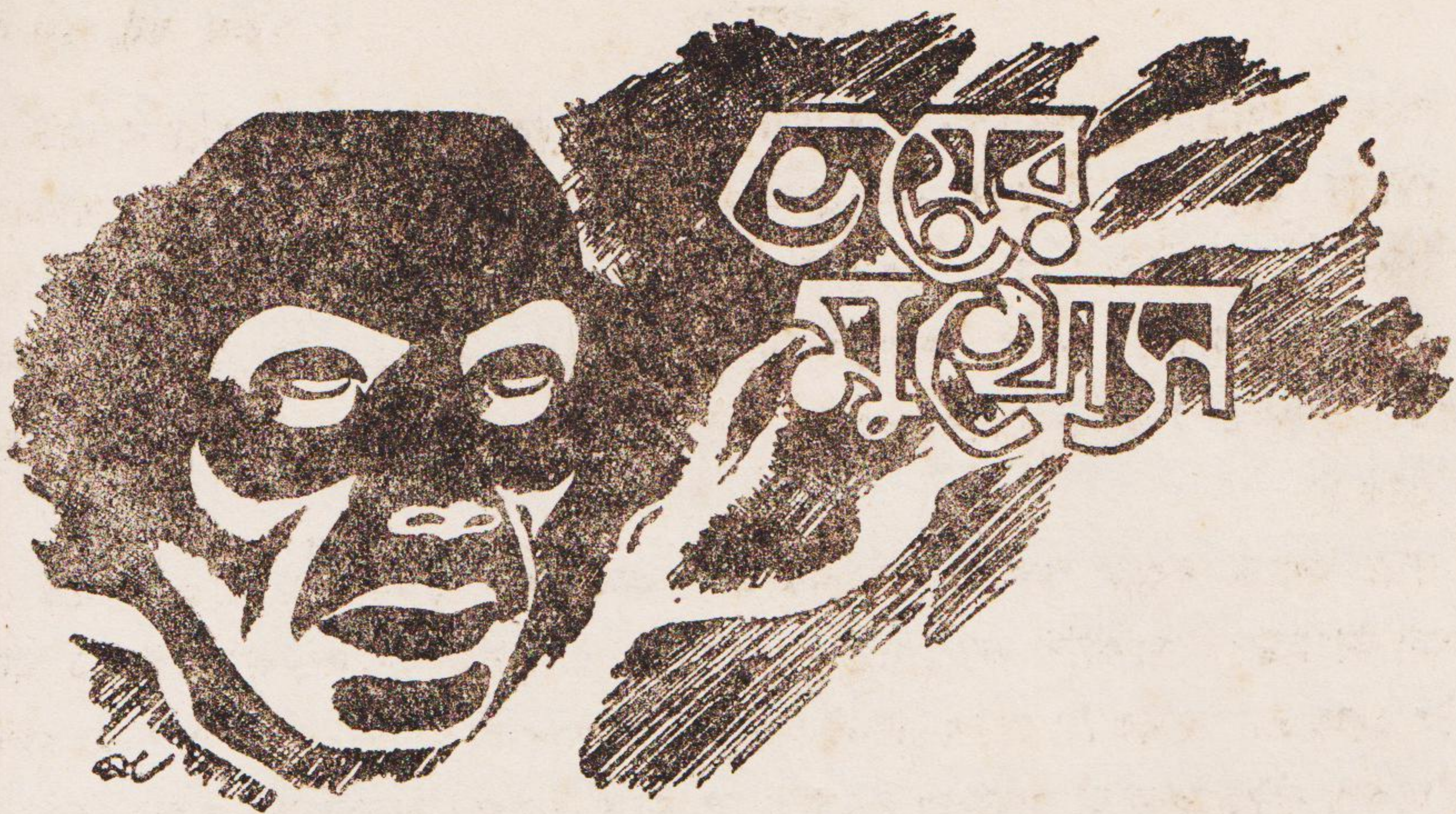
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তপু বলল, আপনি যেখানে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি তো কিছু করলেনও না।

চোপরাও, মিথ্যেবাদী, আ লিম গর্জন করে উঠল, সর্বনাশ করে এসেছিস। যে প্যাকেটটা দিয়েছিলাম, সেটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছিস। সেই প্যাকেট পুলিসের হাতে পড়েছে।

দীপু আর তপু ভাবতে শুরু করল।

চেয়ারে বসা লোকটার কাছে গিয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপরই তারা রেখে এসেছিল, তারপর লোকটা আচমকা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ার পর থেকে সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। প্যাকেটের কথা আর মনেই ছিল না। সেই প্যাকেটটা পড়েছে পুলিসের হাতে ?

কি, চুপ করে আছিস যে ?

দীপু বলল, লোকটা মারা গেছে দেখে আমরা এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আর কিছু মনে ছিল না আমাদের।

মনে ছিল না আমাদের ! আ লিম ভেংচি কাটল, এতদিন আমার দলে রয়েছিস, কাজ করছিস আমার সঙ্গে, আর খেয়াল নেই যে প্যাকেটের ওপর আমার গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা রয়েছে ?

এবার তপু প্রতিবাদ করল।

কতদিন আবার আছি আপনার সঙ্গে? আমরা কি আপনার দলের লোক? আপনি তো ক'দিন হল ভুলিয়ে আমাদের ধরে রেখেছেন।

দীপুও সঙ্গে সঙ্গে বলল।

আমাদের জাহাজে উঠিয়ে দিন, আমরা যে দেশের ছেলে সে দেশে চলে যাই। এসব ঝামেলা আমাদের ভাল লাগছে না।

আ লিম ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল।

থানার মধ্যে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে খুব মিথ্যা কথা বলছিস। তবে, শুনে রাখ, এটা মোটেই থানা নয়। সব সাজানো ব্যাপার। আমার আর এক কারসাজি। মিথ্যা কথা বললে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বের হতে পারবি না।

দীপু অবাক্‌কণ্ঠে বলল, বারে, মিথ্যা বলেছি কিনা, আপনি জানেন না? আমরা এ দেশে এসেছি দশ দিনও নয়। এ দেশের ভাষা জানি না, পথঘাট চিনি না। তার ওপর পদে পদে বিপদ্ ঘটছে। আপনি সে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে, সে তো বন্দুকের গুলিতেই খতম করে দিত আমাদের দুজনকে।

কোন্ লোকটা? আ লিম চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসল।

পোড়োবাড়িতে যে লোকটা মারা গিয়েছিল তার যমজ ভাই। সেই তো রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল, ভান করে, আমরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে বিপদে পড়লাম।

আ লিম নির্বাক্। একটি কথাও বলল না।

তপু প্রায় কান্নাজড়ানো গলায় বলল, আপনার দুটি হাত ধরে মিনতি করছি আমাদের কোনরকমে জেটিতে পৌঁছে দিন। আমরা যেমন করে পারি ফেরবার ব্যবস্থা করব।

তপুর কথা শেষ হতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

আ লিম দাঁড়িয়ে উঠে দু হাতে নিজের মুখটা চাপল, তারপরই পাতলা রবারের মুখোসটা তার পায়ের তলায় খসে পড়ল।

কোথায় আ লিম! এ তো সম্পূর্ণ অন্য একটা লোক।

টকটকে গৌরবর্ণ, কোঁকড়ানো পিঙ্গল চুলের রাশ, তীক্ষ্ণ দু চোখের দৃষ্টি।

দীপু আর তপু আর্তনাদ করে পিছনে সরে গেল।

শোন, ভয় পেও না, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আমি আ লিম সেজে তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, তোমরা আ লিমের দলের নয়। ভয় দেখিয়ে আ লিম তোমাদের দিয়ে তার কাজ হাসিল করত। একটা বড় সুবিধা, তোমরা পথঘাট চেন না, এ দেশের ভাষাও জান না, কাজেই তোমরা প্রায় অন্ধ আর বোবা লোকের সামিল।

অনেক কষ্টে সাহসে ভর করে দীপু প্রশ্ন করল।

আপনি কে?

আমি গোয়েন্দা ম্যালকম। অনেকদিন থেকেই আমি আ লিমের দলের সন্ধানে রয়েছি। তোমাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বলুন।

পোড়োবাড়িতে যে একটা খুন হবে, আমি জানতাম, কিন্তু আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তো তোমাদের দেখতে পেলাম না। অথচ তোমরা বলছ, মৃত লোকটা চেয়ারের ওপর বসে ছিল, তোমাদের ধাক্কায় মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে।

তপু বলল, আমরা গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম।

গুপ্ত সুড়ঙ্গ? ওখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে? গুপ্ত সুড়ঙ্গ যে আছে, তাই বা তোমরা জানলে কি করে? গোয়েন্দা ম্যালকমের চোখে যেন সন্দেহের ছায়া নামল।

দীপু বলল, আমাদের একবার নিয়ে চলুন সেখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

ম্যালকম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, চল তাহলে।

তপু আর পারল না। বলেই ফেলল।

তার আগে কিছু আমাদের খেতে দিন। অনেকক্ষণ কিছু খাই নি।

ও, আমি ভারি দুঃখিত। এ কথাটা আমার মনেই ছিল না।

থানার একটা ঘরেই খাবার ব্যবস্থা হল। বেশ ভাল ব্যবস্থা।

আহার শেষ হতে তিনজনে থানার সামনে দাঁড়ানো মোটরে গিয়ে উঠল।

ম্যালকমই চালাল। পিছনের সীটে দীপু আর তপু।

সেই নদীর ধার। তিনজনে আবার সাম্পানে উঠল।

হাঁটাপথ ধরে গিয়ে পড়োবাড়িতে উপস্থিত হল।

ম্যালকম হাতলের কারসাজি দেখল। তারপর তিনজনে সুড়ঙ্গপথে নেমে গেল। ম্যালকমের হাতে জোরালো টর্চ।

দীপু বলল, এই দেখুন এই বস্তার বালিশে আমরা শুয়েছি।

ম্যালকম হাঁটু মুড়ে বসে কোমর থেকে ছোরা বের করে বস্তার গায়ে বসিয়ে দিল। ফুটো দিয়ে ঝুরঝুর করে কিসের গুঁড়ো ঝরে পড়ল।

ম্যালকম সেই গুঁড়ো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখে বলল, এসব হচ্ছে কোকেন। নেশার জিনিস। এইগুলোর জন্যই এদের মধ্যে শত্রুতা।

কিসের শত্রুতা?

সব জানতে পারবে। এখানে আর কি দেখবার আছে বল?

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখানো হল, তারপর তিনজনে ওপরে উঠে এল।

বাইরে বের হবার সময় ম্যালকম পকেট থেকে একটা বড় তালা বের করে দরজায় আটকে দিল।

তপু সব লক্ষ্য করে বলল, এর আগে দরজায় তালা দেন নি কেন?

দিই নি তার কারণ, আমি জানতাম, যে প্যাকেটটা ফেলে গেছে, সে প্যাকেট নিতে আসবে। আমি আ লিমের দলের কারুর অপেক্ষায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। বাড়ির মধ্যে থেকে ক'দিন পরে তোমাদের বের হতে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি তখন গুপ্ত সুড়ঙ্গপুরীর রহস্যের কথা জানতাম না। ভেবেই পাই নি কোথা থেকে তোমরা এলে। তাই তোমাদের পিছু নিলাম।

পিছু নিলেন?

হ্যাঁ, তোমরা পার হবার আগে অন্য ঘাট থেকে মোটর বোটে পার হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা আলো আমাদের পিছনে আসছিল।

হ্যাঁ, সেটা আমারই সাইকেলের আলো। তারপর লোকটা আহত সেজে তোমাদের যখন বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, তখনও আমি দূর থেকে তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিই তোমাদের বাঁচাই। লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে এসেছিলাম, তারপর গ্রেপ্তার করে হাজতে রেখে দিয়েছি।

তপু জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু লোকটা আমাদের গুলি করতে চেয়েছিল কেন? আমরা তো তার কোন ক্ষতি করি নি।

ম্যালকম হাসল, সে মস্ত বড় কাহিনী। চল থানায় ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে তোমাদের সব বলব।

বিকালের দিকে থানার পাশে কোয়ার্টারের বারান্দায় তিনজন বসল। পাশাপাশি। একটা ইজিচেয়ারে ম্যালকম। দুটো চেয়ারে দীপু আর তপু।

একটা চুরুট ধরিয়ে ম্যালকম বলতে আরম্ভ করল।

রেঙ্গুন শহরে দুটো দল আছে। একটা আ লিমের দল, আর একটা সোলেমানের দল। দুটো দলই আবকারী জিনিস পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে এদিক ওদিক চালান দেয়। এ সব নিষিদ্ধ জিনিসের চালানের ব্যাপারে রেষারেষি থাকেই। সেই রেষারেষি থেকে খুন ও জখম হয়। কতকগুলো লোক আছে তাদের আফিং, কোকেন-এতেও ভাল নেশা হয় না, তারা সাপের বিষ পর্যন্ত হজম করে।

সোলেমান সাপের বিষ দিয়ে বড়ি তৈরি করত, বিশেষ মহলে সেই বড়ির দারুণ চল

ছিল। সোলেমানের যে যমজ ভাই ছিল সেটা আমরা জানতাম না, জানতে পারলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।

কেন? তপু জিজ্ঞাসা করল।

কারণ যতবারই এই সাপের বিষে কারো মৃত্যু হয়েছে, আমাদের সন্দেহ থাকলেও সোলেমানকে ধরতে পারি নি, কারণ সাক্ষীরা চেহারার যে বিবরণ দিয়েছে তাতে বেশ বোঝা গেছে যে সোলেমানই বড়ির প্যাকেট সে বাড়ির মালিককে দিয়েছে। সোলেমানকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে সেই সময় সে ঘটনাস্থল থেকে তিনশো কি দুশো মাইল দূরে ছিল।

কি করে? দীপু অবাক্ হল।

যখন এক জায়গায় সোলেমান বড়ির প্যাকেট দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে তার যমজ ভাই দুশো মাইল দূরের কোন শহরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল সার্জনদের একটা বিরাট পার্টি দিয়েছে। তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে সোলেমান সেই সময়ে তাঁদের মধ্যে ছিল। দুজনেই এক নাম ব্যবহার করত, এবং চেহারায় এত মিল, যা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ, যে একজনকে আর একজন ভাবা খুবই স্বাভাবিক।

সোলেমানকে খুন করেছিল তারই এক সহকারী।

সহকারী? তপু জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। আ লিম তাকে টাকা দিয়ে নিজের দলে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কি করে মারল? তার দেহে তো কোন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না।

তোমরা আর কি করে দেখবে! আমাদেরই অনেক খোঁজ করে আঘাতের চিহ্ন বের করতে হয়েছিল। ডাক্তার মৃত্যুর কারণ বলেছিল বিষপ্রয়োগ। এমন তীব্র বিষ যে মুখে দিলে মুখ পুড়ে যাবার কথা। তারপর অনেক চেষ্টার পর ঘাড়ে একটা ছোট দাগ দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ঘাড়ের পেশীর ওপর কেউ ইনজেকশন দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু।

ম্যালকম একটু দম নিল, তারপর বলল।

সোলেমানকে যে আ লিমের লোক মেরেছে সেটা তার ভাই সন্দেহ করেছিল। তোমরা আ লিমের দলের লোক সেটাই তার বিশ্বাস, অবশ্য আমার নিজেরও তাই ধারণা ছিল। সেই-জন্যই সোলেমানের ভাই তোমাদের খতম করে দিতে চেয়েছিল।

তাকে আপনি কি মেরে ফেলেছেন?

দীপু ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

না, না, ম্যালকম হাসল, আমরা পুলিস, আমরা মানুষ মারি না। বললাম যে তাকে হাজতে রেখেছি। অনেক কিছু কথা ইতিমধ্যে সে বলেও ফেলেছে।

কিন্তু আপনি আ লিমের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন?

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে ম্যালকম আবার মুচকি হাসল, তারপর বলতে লাগল।

যদি সত্যি তোমরা আ লিমের দলের হতে তাহলে আ লিমের কাছে সব কিছুই বলতে। এভাবে বার বার তার দলের লোক নও বলে আপত্তি করতে না। তোমাদের মুখের চেহারা, কথাবার্তার ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম, তোমাদের আ লিম ধরে এনেছে। তার দলে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে তা জানতাম, আর এও জানতাম সে এইসব ছেলেদের বেশীদিন দলে রাখে না। কিছু কাজ করে নিয়ে শেষ করে দেয়। তোমাদেরও তাই দিত।

আমাদেরও দিত?

হ্যাঁ দিত, কারণ সব গুপ্ত আস্তানার সন্ধান জানে এমন ছেলে বেঁচে থাক এটা সে চায় না। কোথায় কোথায় সে নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, এ সব জানে এমন লোক থাকুক, এটাও তার অভিপ্রায় নয়!

আ লিমকে ধরেছেন আপনারা?

না, ম্যালকম আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, এখনও তাকে ধরা সম্ভব হয় নি। তার জুয়ার আড্ডায় একবার আমরা হানা দিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকে ধরতে পারি নি। সকলে পলকের মধ্যে যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেখানেও বোধ হয় কোন পাতালের কারসাজি ছিল।

দীপু আর তপু একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনাদের হামলার সময় আমরাও সেখানে ছিলাম। সেখানেও এক সুড়ঙ্গপথ আছে নদী পর্যন্ত।

ম্যালকম এবারে খুব মৃদু কণ্ঠে বলল।

সেই গুপ্ত আস্তানার সন্ধান সেবারেও একটি ছেলে দিয়েছিল। আ লিমের দলের ছেলে। জাতে বর্মী। বেচারী!

কেন, বেচারী কেন?

তপু প্রশ্ন করল।

তাকে আমি তোমাদের মতনই নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, যেন বাড়ির বাইরে না যায়। কিছুদিন ছেলেটি আমার কথা শুনেছিল। বাড়ির মধ্যেই ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার সাহস বাড়ল। প্রথমে বাগানে ঘুরে বেড়াত, একদিন বাড়ির বাইরে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি!

ফিরে আসে নি?

না, জীবন্ত আর ফিরে আসে নি। দিন তিনেক পরে আমার নামে একটা পার্সেল এসেছিল। আমার এক বোন থাকে ইয়েমেদিনে, তার কাছ থেকে। খুলেই চমকে উঠেছিলাম।

কি ছিল তাতে? দীপু জিজ্ঞাসা করল।

সেই ছেলেটির মাথা।

দীপু আর তপুর কণ্ঠ থেকে আর্ত স্বর বের হল।

সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা, আ লিম বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না।

চেয়ার ছেড়ে দীপু আর তপু ম্যালকমের দু পাশে এসে দাঁড়াল।

তপু বলল, তাহলে কি হবে? আমরা কি করে বাঁচব?

খুলেই চমকে উঠেছিলাম।

ম্যালকম দুটো হাত প্রসারিত করে দুজনের পিঠে রাখল। বলল।

ভয় নেই, তোমরা যদি এ বাড়ির বাইরে না যাও তাহলে কোন ক্ষতি কেউ তোমাদের করতে পারবে না। আমি বাড়ির চারপাশে সাদা পোশাকে পাহারাও রেখেছি, তারা তোমাদের ওপর দৃষ্টি রাখবে।

আমরা আমাদের ঘর থেকেই বের হব না।

দীপু কাঁপাগলায় বলল।

ম্যালকম বলল, উপস্থিত কালই তো আমাদের সঙ্গে বের হতে হবে। সেই গুপ্ত আস্তানা আমরা চিনি, কিন্তু সুড়ঙ্গপথটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে।

দীপু আর তপুর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ম্যালকম আবার বলল।

কোন ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে বন্দুক পিস্তল নিয়ে কিছু পুলিস থাকে।

একটা কালো মোটর। ভিতরে ম্যালকম, দীপু আর তপু। সঙ্গে গোটা ছয়েক পুলিস। বন্দুক আর পিস্তল উঁচিয়ে।

খুব সাবধানে চারদিকে দৃষ্টি রেখে মোটর এগিয়ে চলল।

পথে কোন লোক কৌতূহলবশতঃ দাঁড়ালেই পুলিস চীৎকার করে তাদের হটিয়ে দিল।

অনেকটা যাবার পর ম্যালকম ড্রাইভারকে কি বলল।

পাশে নদী। এদিকে ঝাঁকড়া গাছের সার।

ম্যালকম বলল, ঠিক আছে, এটাই সেই আস্তানা, যেখানে একবার আমরা এসেছিলাম। এই তো আগাছার ঝোপ আর ইঁটের পাঁজা।

দীপু আর তপুর দিকে ফিরে ম্যালকম বলল, এবার আস্তে আস্তে নেমে এস তোমরা।

দীপু আর তপু নামতে যাবার মুখেই বিপর্যয়।

দারুণ একটা শব্দে আশপাশের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। ধূলার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

আফ্রিকার রত্ন

পৃথিবীতে যত হীরা উৎপন্ন হয় তার মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগ উৎপন্ন হয় আফ্রিকায়। বর্তমানে পৃথিবীতে যত হীরা উৎপন্ন হয় তার ওজন প্রায় ২৩ মিলিয়ন ক্যারাট। এক ক্যার্যাট ৩½ গ্রেনের মত। এক গ্রেন প্রায় এক পাউণ্ডের সাত হাজার ভাগের এক ভাগ।

হীরাও পোড়ে

আজ অবধি যত জিনিস জানা গেছে তার মধ্যে হীরা হল সব থেকে কঠিন ও অভঙ্গুর পদার্থ। এই হীরা কয়লা থেকে তৈরী। বিশেষজ্ঞরা বলেন বাতাসে রেখে জোরে আগুন দিলে হীরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ম্যালকম আচমকা দীপু আর তপুর হাত ধরে শুইয়ে না দিলে মারাত্মক কাণ্ড হত। মোটরের জানলার কাঁচগুলো ভেঙে চারদিকে ছিটকে পড়ল। সেই কাঁচের একটা খণ্ড শরীরে লাগলে খুবই বিপদ্ হত।

ম্যালকম নিজেও সটান শুয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে ম্যালকম উঠে বসল। এদিক ওদিক দেখে সবাইকে বলল, উঠে পড়।

পুলিসরাও এদিক ওদিক টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এবার তারাও উঠে দাঁড়াল।

বেশ একটু দূরে কিছু লোকের জটলা। আওয়াজ শুনে এসে জড় হয়েছে, কিন্তু সাহস করে সামনে আসতে পারছে না।

দীপু বলল, কিসের শব্দ বলুন তো ?

ম্যালকম লাফিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বলল।

বোমার। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল। ক্ষতি করতে পারে নি, কারণ বোমাটা আগেই ফেটে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইটের পাঁজার ফাঁক থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া কমে যেতে ম্যালকম পুলিসদের দিকে ফিরে হুকুম দিল, এগিয়ে চল, কিন্তু খুব সাবধানে।

প্রথমে পুলিসের দল, তারপর ম্যালকম, সব শেষে দীপু আর তপু পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে একটু নেমেই থেমে পড়ল।

অল্প অল্প ধোঁয়া তখনও বের হচ্ছে। মেঝের অনেকটা জুড়ে কালো দাগ। নীচে দিয়ে নদীর ধারে যাবার গুপ্ত পথ খোলা রয়েছে।

ঠিক কালো দাগের পাশে বীভৎস একটা মূর্তি। মুখের কিছু অংশ উড়ে গেছে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে স্থানে স্থানে।

তবু চেনা গেল। আ লিম।

ম্যালকম কিছুক্ষণ নীচু হয়ে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করল তারপর বলল।

আ লিম বোমাটা ছুঁড়তে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য আমাদের সৌভাগ্যবশত, বোমাটা ইটে ধাক্কা লেগে আবার ফিরে এসে তার গায়ের ওপরই পড়েছে। বোমাটা কি ভয়ংকর বুঝতেই পারছ। যার শব্দতরঙ্গে মোটরের কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সে বোমাটা সরাসরি পড়লে আমাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

ম্যালকম কথা শেষ করে পুলিসদের দিকে চোখ ফেরাল। বলল।

অপরাধের ফল মৃত্যু। এতদিন ধরে এ লাইনে কাজ করে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

সকলে আস্তে আস্তে নেমে মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

এইখানে জুয়ার আসর বসত। পুলিসে সেবার হামলা দেবার পর থেকে বোধ হয় আসর আর বসে নি।

দীপু বলল, গুপ্ত সড়ক তো দেখতেই পাচ্ছেন ?

ম্যালকম ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আ লিম রাস্তা পরিষ্কার করেই রেখেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের খতম করে নদীপথে সে সরে পড়বে। নদীর ধারে নিশ্চয় যাবার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল। চল, নামি।

সকলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর বুকে গোটা তিনেক জাহাজ। একেবারে মাঝখানে। অনেকগুলো সাম্পান এখানে ওখানে ভাসছে।

অনেক দূরে ছোট একটা কালো বিন্দু।

ম্যালকম পকেট থেকে দূরবীন বের করে চোখে লাগিয়ে দেখল, তারপর বলল, ঐ একটা মোটর-লঞ্চ ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় এই মোটর-লঞ্চটাই এখানে অপেক্ষা করছিল। গোলমাল দেখে সরে পড়েছে।

সবাই ওপরে উঠে এল।

ম্যালকম একজন পুলিসকে ডেকে বলল।

তুমি হেড-কোয়ার্টারে চলে যাও। একটা ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে আ লিমের ফটো তোলার ব্যবস্থা কর। আর একজন বারুদ-বিশারদকেও নিয়ে আসবে। বোমার টুকরোগুলো তুলে নিয়ে রিপোর্ট দেবে।

হঠাৎ তপুর মনে পড়ে গেল।

একবার ওপরে চলুন, এর পাশেই আমাদের আটকে রেখেছিল।

দীপু বলল, একটা চিতাবাঘও আছে ওখানে। ওদের কথা না শুনলে বলেছিল, আমাদের চিতাবাঘের মুখে ফেলে দেবে।

তাই নাকি ? ম্যালকম বলল, চল তো দেখে আসি।

পুলিসরা রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে ঢুকল ম্যালকম, দীপু আর তপু।

ম্যালকম হাতের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে রইল।

দরজায় বিরাট একটা তালা।

একবার টেনে দেখে ম্যালকম বেরিয়ে এসে একটা পুলিসকে ডাকল।

পুলিস কাছে আসতে তাকে নীচু গলায় কি বলতেই সে ছুটে মোটরের ভিতর থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল।

ম্যালকম একটা দুটো করে কয়েকটা চাবি তালার মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে শব্দ করে তালাটা খুলে গেল।

আনন্দে দীপু চীৎকার করে উঠল।

খুলেছে, খুলেছে।

দরজাটা ঠেলে দীপু ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন। দীপুর মনে হল পীত রংয়ের একটা বিদ্যুৎ এক কোণ থেকে ছুটে এল।

সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দীপু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুড়ুম।

ম্যালকমের পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

দীপু যখন চোখ মেলল, দেখল মাথার কাছে ম্যালকম আর তপু বসে।

ম্যালকম জিজ্ঞাসা করল।

কি, শরীর ঠিক হয়েছে ?

ঘাড় নেড়ে দীপু উঠে বসতেই তার চোখে পড়ে গেল।

ম্যালকমের পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করল। [পৃষ্ঠা ৮৭

কোণের দিকে চারটে পা প্রসারিত করে চিতাবাঘটা পড়ে রয়েছে। মৃত।

ম্যালকম বলল।

তোমাদের বন্ধু আ লিম চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। বোমা হাতে জুয়ার আড্ডার মুখে নিজে অপেক্ষা করছিল। যদি আমরা প্রথমে এদিকে আসি, সেজন্য চিতাবাঘটাকেও খুলে রেখেছিল। আমি অবশ্য এ ধরনের কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম, সেইজন্যই পিস্তল নিয়ে তৈরী ছিলাম। দেখলে তো তোমরা ভাল করে, পাপ কখনও জয়ী হতে পারে না। পাপের পতন অনিবার্য।

ম্যালকম তন্নতন্ন করে এদিক ওদিক সব খুঁজল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

বোঝা গেল, এটা শুধু আ লিমের বন্দীশালা। নতুন নতুন যাদের ধরে আনত, তাদের এই ঘরে আটকে রাখত। চিতাবাঘের ভয় দেখাত। চল, এবার বাইরে যাই।

তিনজনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ম্যালকমের ইঙ্গিতে দুজন পুলিস বাঁশে বেঁধে চিতাবাঘের দেহটাও তুলে নিল।

ফেরবার সময় পুলিসের কালো মোটর নয়, ছোট একটা সবুজ মোটরে তিনজন ফিরল।

গাড়িতে উঠে ম্যালকম বলল।

মোটর বদলালাম। কারণ আমার মনে হচ্ছে আ লিমের অনুচরেরা সহজে ছাড়বে না। কালো মোটরের ওপর নজর রাখবে।

কেন, নজর রাখবে কেন?

তপু প্রশ্ন করল।

রাখবে, তার প্রথম কারণ, প্রতিশোধস্পৃহা। আমাকে খতম করার চেষ্টা করবেই। দ্বিতীয় কারণ, আ লিমের মৃতদেহ।

আ লিমের মৃতদেহ? কেন?

দীপু আশ্চর্য হল।

আমার মনে হচ্ছে, কিছু কাগজপত্র বা অন্য কিছু তার কাছে আছে, সে তো দলপতি।

তপু জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু আপনি তো আ লিমের দেহ সার্চ করেছেন?

ম্যালকম গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তা করেছি। কিন্তু কিছুই পাই নি।

তবে?

তপুর এ প্রশ্নের ম্যালকম কোন উত্তর দিল না। বাইরের দিকে চোখ মেলে চুপ করে বসে রইল।

যথাসময়ে মোটর থানার সামনে এসে দাঁড়াল।

দীপু আর তপু ম্যালকমের বাড়ির মধ্যে চলে গেল। ম্যালকম থানায় ঢুকল।

ম্যালকম যখন ফিরল, তখন বেশ রাত।

দীপু আর তপু খাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে ছিল, ম্যালকম ওপরে এল।

কি, তোমরা এখনও শুয়ে পড় নি?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

হুঁ।

গম্ভীর মুখে ম্যালকম একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ম্যালকম বলল।

আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে।

দীপু আর তপু একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল।

কি, কি হয়েছে?

কালো ভ্যানের ওপর আবার আক্রমণ হয়েছে।

আক্রমণ?

হ্যাঁ, ভিড়ের মধ্যে থেকে কে আবার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার হতে পারে এ বিষয়ে আমি আগেই সজাগ করে দিয়েছিলাম, তাই

বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। আ লিমের মৃতদেহ নিয়ে মোটর ঠিকই হাসপাতালে পৌঁছাতে পেরেছিল। তাছাড়া, আমার কাজও হয়েছে।

কি কাজ?

আ লিমের দেহ থেকে দরকারী কাগজ উদ্ধার করতে পেরেছি। হাঁটুর মাংস চিরে পকেটের মতন তৈরি করে একটা কাগজ লুকানো ছিল। ডাক্তারের সহায়তায় মাংস কেটে সে কাগজ সংগ্রহ করেছি।

নিজের শরীরের মধ্যে পকেট তৈরি করে?

হ্যাঁ, ম্যালকম হাসল, এটা অপরাধীদের একটা সাধারণ পন্থা। কয়েদীরা জেল থেকে এইভাবে পয়সাকড়ি বের করে নিয়ে আসে, যারা নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, তারা পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে এইভাবে লুকানোর জায়গা তৈরি করে নেয়।

দীপু আর তপু সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একটু পরে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

যে কাগজটা পেয়েছেন, সেটা নিশ্চয় খুব দরকারী।

ম্যালকম হাসল।

হ্যাঁ, দরকারী বৈকি। খুব ছোট একটা ফিল্ম। খালি চোখে পড়াই যায় না। জোরালো লেন্সের সাহায্যে প্রজেক্টরের ওপর চড়িয়ে সামনের এক সাদা পর্দায় প্রতিফলিত করালাম। ঠিক যে ভাবে সিনেমার ছবি দেখায়। লেখাগুলো বহুগুণ বর্ধিত হল। সব ঠিকানা। সারা ব্রহ্মদেশে যেখানে যেখানে আ লিমদের আস্তানা আছে, তার ঠিকানা। বুঝতেই পারছ এটা আমাদের পক্ষে কত দরকারী। ইতিমধ্যে গোপন টেলিগ্রাম চলে গেছে থানায়, থানায়। আজ গভীর রাত্রে হানা দিয়ে ধরপাকড় শুরু হবে।

ম্যালকম উঠে দাঁড়াল।

ব্যস, আর নয়। এবার উঠে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

দিন তিনেক পর থানায় ডাক পড়ল। দীপু আর তপুর।

ম্যালকম বসে ছিল। তার পাশে এক পুলিস অফিসর।

অফিসরটি ওদের নাম, ধাম, অভিভাবকের নাম সব লিখে নিল।

সব হয়ে যেতে ম্যালকম বলল।

তোমাদের সাহায্যের জন্যই আমাদের অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছে। আ লিমকে জীবন্ত ধরতে পারি নি বটে, কিন্তু তার অনেক শাগরেদ ধরা পড়েছে। অনেক নিষিদ্ধ জিনিস আমাদের হাতে এসে গেছে।

সরকার পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের দুজনকে কিছু টাকা দেবেন। তাছাড়া তোমাদের দেশে ফিরে যাবার সব খরচও সরকার বহন করবেন।

দেশে ফিরে যেতে পারব!

দীপু আর তপু দুজনের চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু করে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

টাকাটা পরের দিনই হাতে এল।

কম নয়। এক একজনের ভাগে দুশ। এত টাকা একসঙ্গে দীপু আর তপু কোনদিন দেখে নি।

ম্যালকম কাছে এসে দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

শোন, তোমাদের কয়েকটা কথা বলি। এভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তোমরা কতখানি অন্যায় করেছ, আশা করি এখন বুঝতে পারছ। ভাগ্য ভাল যে বেশী বিপদের মধ্যে পড় নি। মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারত। লেখাপড়া শিখে, বড় হয়ে দেশভ্রমণে বের হওয়া উচিত। এভাবে চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালিয়ে, জাহাজ কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে, বিদেশে এলে কি হয়, তার স্বাদ তোমরা ভালভাবেই পেলে। এবার বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, পাপের পথ সর্বদা পরিহার করবে কারণ পাপের ফল কি সেটা নিজেদের চোখেই দেখে গেলে।

কাল সকালেই তোমাদের জাহাজ ছাড়বে। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, কোন অসুবিধা হবে না। আমি থাকতে পারব না। আজ রাত্রেই একটা কাজে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। গুড-বাই!

দীপু আর তপু ম্যালকমের প্রসারিত হাতটা একে একে আঁকড়ে ধরল।

তপু বলল, বিদেশের বন্ধু, বিদায়!

সত্যিই কোন অসুবিধা হল না।

একজন পুলিস অফিসর সঙ্গে করে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। বোধ হয় দীপু আর তপুর সম্বন্ধে।

এ জাহাজের নাম, এস. এস. অ্যাঙ্গোরা।

আবার তিন দিন নীল সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া জীবন।

দুজনে ডেক থেকে ডেকে ঘুরে বেড়াল। ক্যাপ্টেন এসে তাদের পিঠ চাপড়াল।

বলল, তোমরা বীর বালক। বিরাট একটা বদমাইশের দলকে ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছ।

সারেংরা বিস্মিতদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

তিন দিন পর স্থলের রেখা দেখা গেল। বোঝা গেল মাটি মায়ের কি দুর্বার আকর্ষণ। সবাই সার দিয়ে দাঁড়াল রেলিং ধরে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল গাছপালা, বাড়িঘর, কলকারখানা।

জল আর নীল নয়, ঘোলাটে। আশপাশে অনেক স্টীমার, জেলে ডিঙ্গি দেখা গেল। নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি।

রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে দীপু আর তপু প্রণাম করল।

মাথা তুলেই দুজনে অবাক্।

জেটি দেখা যাচ্ছে। জেটির বারান্দাভর্তি লোক।

তার মধ্যে দীপুর বাবাকে দেখা গেল। তিনি আকুলদৃষ্টিতে জাহাজের দিকে দেখছেন।

দীপু আর তপু রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুটকণ্ঠে দীপু বলল, বাবা। তপু বলল, জেঠু। তারপর চোখের জলে সামনের পৃথিবী অস্পষ্ট হয়ে গেল।

সমাপ্ত